বাঙালির
মিডিয়োক্রিটির
সন্ধানে
ফাহাম
আব্দুস
সালাম

বাঙালির
মিডিয়োক্রিটির
সন্ধানে
ফাহাম
আব্দুস
সালাম

ফাহাম আব্দুস সালামের লেখার সাথে পরিচিত সবাই জানেন যে ফাহাম ভালো লিখতে পারেন। তবে ফাহামের তিনটি গুণ আলাদা করে বলা যায়, যা লিখতে পারেন এরকম বহু লোকের মাঝে আমরা খুঁজি কিন্তু পাই না।

ফাহাম চিন্তা করতে জানেন। চিন্তার ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমরা কেনেডিয়ান সাইকোলজিস্ট জর্ডান পিটারসনের কথা ধার করতে পারি। তিনি বলছেন যে, মানুষ সাধারণত তাদের মাথায় যে চিন্তাটা আসে সেটা নিয়ে চিন্তা করে না। অর্থাৎ যে কোনো ইস্যুতে একটি সাধারণ ভাবনা তাদের আসে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাথমিক ধারণাটা কতটা উপযুক্ত হয়েছে তা নিয়ে তারা আর চিন্তা করতে পারে না। ফাহাম এই কাজটা পারেন। তিনি পদ্ধতিগতভাবে চিন্তা করতে পারেন বলে নিজের ভাবনাকে ছকে নিতে পারেন। যদি ফাহামের কোনো চিন্তায় ভুল থাকে তাহলে সেটাও তিনি পদ্ধতিগতভাবেই করেছেন। তাই কোথায় ভুল হয়েছে সেটা ধরিয়ে দিতে পারলে তিনি বুঝবেন। সবাই বোঝে না।

যেহেতু চিন্তা করতে পারেন, তাই ফাহাম অন্যের কথার যুক্তি তলিয়ে দেখতে পারেন। ফলে অন্যের ব্যক্তি-সমালোচনা না করে তিনি প্রত্যেকের কথাকে সেই চিন্তার মাপকাঠিতে যাচাই করে সেটাকে সমর্থন বা সমালোচনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে তার নিজের প্রেজুডিস যেন কাজ না করে সেই প্রচেষ্টা ফাহামের থাকে। অনেকেরই থাকে না।

ফাহাম চিন্তা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটিকে অকপটে বলতে পারেন। সিদ্ধান্ত সঠিক হলে, সেটিকে তিনি কাউকে খুশি করার জন্য অথবা কেউ বেজার হবে— এই চিন্তায় আটকে রাখেন না। বলাই বাহুল্য যে এ কাজটিও বহু লোক করতে পারেন না।

এ তিনটি গুণ ফাহাম আব্দুস সালামের চিন্তা ও লেখাকে আলাদা করবে।

Price: ৳400, ₹400, $13

বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে

বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে

ফাহাম আব্দুস সালাম
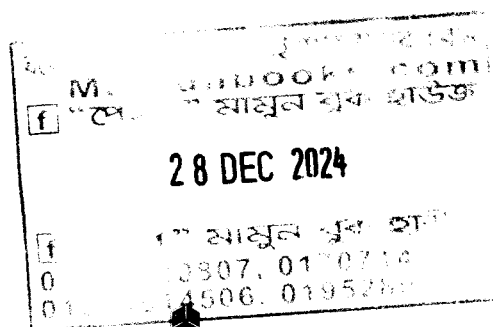
প্রকাশক: **আদর্শ**
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
hello@adarsha.com.bd www.adarsha.com.bd
myAdarsha my.Adarsha c/myAdarsha company/adarsha

বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে
৩য় মুদ্রণ: ১০ই মাঘ, ১৪২৯; ২৪শে জানুয়ারি, ২০২৩
(এ যাবৎ কালে ৫,০০০ কপি মুদ্রিত)
৩য় মুদ্রণ: ১৮ই পৌষ, ১৪২৯; ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
২য় মুদ্রণ: ৮ আষাঢ় ১৪২৯; ১৯ জুলাই ২০২২
১ম আদর্শ সংস্করণ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৮; ৪ মার্চ ২০২২

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স
রকমারিতে আদর্শর বই: www.rokomari.com/adarsha

Bangalir Mediocrityr Shondhane (Published in Bengali)
by Faham Abdus Salam
Published by Adarsha
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100
ISBN: 978-984-96564-1-8

উৎসর্গ

আমাদের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো— আমাদের সামনে।
সেই দিনগুলো শেহভার মা, শুধু তোমাদেরই জন্যে।

ভূমিকা

প্রতিটি লেখক জন্ম নেয় ভুল সময়ে— আর তার প্রায়শ্চিত্ত কেবল একটিই: যারা মারা গেছে আর যারা জন্ম নেয় নি— তাদের মাঝে একটা জাল বুনে দেয়া। সৌভাগ্য আমার যে আমি দুঃসময়ের লেখক। সৌভাগ্য আমার যে আমার সময়ে শুধু সত্য বললেই যথেষ্ট মনে হয়, আর মনে হয় বৈক্রমিক। সত্য বলার সুফল এতো বিপুল হলে চিন্তার বোঝা কে নেবে বলুন?

এ কারণেই কি আমাদের সময়টা এতো নিষ্ফলা? সবাইকে এতো চিৎকার করতে হয় সুফলা হওয়ার জন্যে যে চিন্তা করলে মনে হয় যে মরে যাওয়া বিখ্যাত মানুষদের সাথে কেন যেন অকারণ অনাস্থা রাখা হোলো— তাই নাহ? বোবা তো তারাই হয়, যারা প্রায়শ্চিত্ত করছে উচ্চস্বরকে সন্দেহ না করার, যারা বাগাড়ম্বরকে গ্রাহ্য করেছে 'অন্তত' বলে।

আমি সেই সময়ের লেখক যখন সত্য এতোটাই স্পষ্ট যে তাকে মিথ্যার বিপরীতে দাঁড় করালে অপচয় মনে হয়। আমি বলছি মিথ্যার বিপরীতে অন্তত 'চিন্তা'কে মেনে নিন।

খোরপোশ, সত্য দেবে— সে কথাই রইলো তাহলে।

বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে আদর্শ। আমি তাদের ভয় দেখিয়েছি যে বই বিক্রির সংখ্যা দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতার শুমার করলে কিন্তু খোদার গজব নামবে। তারা অভয় দিলো যে অফিসে নাকি বেশীরভাগই বিবাহিত— দিনে দুপুরে সাহস দেখানো রপ্ত করেছে। য়ে মানে একটু স্বস্তি পেলাম মনে। মৃত্যুঞ্জয়ীরা তাহলে প্রকাশনা শিল্পেও জায়গা করে নিচ্ছে।

২৭/০২/২০২২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে বলে যে ভুল বারবার করি, সেই ভুলটাকেই "দেশ" বলে ডেকেছি— যে দেশটা রয়ে গেলো শুধু আমার স্মৃতিতে। সব কিছু এগিয়ে গেলো আমি ছাড়া। নাছোড় আমি স্মৃতির মহড়াকে বলি প্রেম— আপনার কাছে সেটা দেশ।

কোথায় থাকে দেশটা? স্মৃতিতেই শুধু— মনে হয়। এই সঙ্গীন প্রেম আর কোথাও বাসা না বাঁধে। থাকতে দিয়েছি তাকে একটু একটু করে সবটুকু জুড়ে। আমি চলে গেলে একদিন সেই জায়গাটুকু আপনার হয়ে যাবে। আমি শুধু চেয়েছিলাম সেই স্বপ্নপুরীর সন্ধান আপনাকে দিতে। হয়তো সে ভাষা আমার নেই, নয়তো সেই হৃদয়— আপনার। সেখানে অভাব ছিলো, ভালোবাসাও ছিলো। মানুষ তার অভাবকেই শুধু ভয় করতে শেখে, আর সে আশংকার প্রায়শ্চিত্ত করে তার স্মৃতির সাথে দেনদরবার করে।

স্মৃতি, আহ! জানি শুধু কোথায় তা ফেলে রাখা যায়— বেরোয় তো সে নিজের খেয়ালে।

বহু আগে আমরা দেশে থাকতাম। টেকনোলজি, নিঃশ্বাস ফেলার আগে আপনাকে বদলে দিচ্ছে, আর আপনার চারপাশ। এখন আর কেউ কোনো দেশে থাকে না— সময়ে থাকে। আমার দেশটা মনে হয় ২০০৪-এই আটকে আছে— এরপর সবাই আমাকে ফেলে সামনে চলে গেলো। আর আমি যখন দেশে যেতে চাই, ভুলে ২০০৪-এ ফিরে যাই। "*The past is a foreign country; they do things differently there.*" হার্টলির সেই বিখ্যাত প্রথম লাইন— দা গো বিটউইনের। অল্প বয়সে বুঝিনি

কথাটা কোনোদিন আমাকেও বুঝতে হবে। অক্ষরে আর অভিমানে। আমার আর দেশে যাওয়া হোলো না কোনোদিন।

সেই দেশটা এখন আর কোথাও নেই– আমি জানি। এমন দুর্বিষহ বিষাদকে উদযাপন করতেই মনে হয় মানুষকে জাতীয়তাবাদ আবিষ্কার করতে হয়েছে। অতীতকে সুরক্ষা দিতে যে ইট আপনি বিলি করে যান দিন থেকে দিনে, জন থেকে জনে– একদিন প্রাসাদ হবে বলে কথা দিয়েছিলেন ছোট্ট মেয়েটাকে– বিশ্বাস করুন আমাকে, সেটা একদিন গারদ হবে– জাতীয়তাবাদ আর কিচ্ছু বানাতে শেখে নি। কিছু একটা নিরঙ্কুশ থাকুক অন্তত, থাকুক নিষ্কলুষ– এই তাড়নায় বোকা মানুষরা জাতীয়তাবাদের পাঁচিলে ইট গোজে।

বিলি জোল ঠিকই বুঝেছিলেন এই বিষাদের ব্যাকরণ। *"Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. But it's sad and it's sweet and I knew it complete. When I wore a younger man's clothes"* ঐ যে younger man's clothes-এর নীচেই আছে সব আশা-নিরাশার চৌরাস্তা।

মাথায় আছে কিন্তু সামনে নেই– এই অবিশ্বাস্য বেদনাকে মোকাবেলা করতে মানুষকে কল্পনা করতে হয়। মানুষই তাই ধর্মকে খুঁজে নেয়– উল্টোটা নয়। কিন্তু আমি কী খুঁজবো– এই প্রশ্নের উত্তর দেবে বলে যে একদিন কথা দিয়েছিলো দরাজ গলায়, তার সাথে আর কোনোদিন দেখা হোলো না আমার।

দেশপ্রেম চলে গেলে– চলে গেলেই শুধু– রয়ে যায় প্রেমের দেশ। আমি সেখানেই থাকবো। আপনি?

সূচি

বাঙালির বিপ্লব

বাঙালি বারে বারে প্রথম থেকে শুরু করতে চায়। কেননা সে তার পূর্বতর ভুল ও মিথ্যা ভরা অচলায়তনকে প্রশ্ন করতে অপারগ, মোকাবেলা করতে অনিচ্ছুক। সে মনে করে যে নতুন একটা শুরুর মানে হোলো যা কিছু তার কীর্তি, তা সব তামাদি হয়ে যাওয়া। বিশ্বাস তার নিশ্চিত যে ভুলকে ডিজওন করা হোলো সঠিকত্বের পথে সংক্ষিপ্ততম ও একমাত্র পথ। ধ্বংসই তার চোখে শ্রেষ্ঠ সমতাকারী— তাই ধ্বংস ছাড়া নতুন কিছু শুরু— তার কাছে অলীক ভাবনা।

আঠারো বছরের প্রেমে মোহ, কাম আর ভালোবাসাকে আলাদা করা যতোটা কঠিন তার চেয়ে বেশী কঠিন বাঙালির দেশপ্রেমে ঘৃণা, ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষা, সাম্য আর কৌশলী শঠতাকে আলাদা করা। বিপত্তি হোলো, সে আলাদা করার অনিচ্ছার মাঝেই দেশপ্রেমের প্রাবল্য অনুভব করে। তার বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্যকে শুদ্ধের প্রতি আসক্তি বলে মনে করে প্রথম থেকে শুরু করার এই ইচ্ছাকে ভক্তি সহকারে নাম দিয়েছিলো 'বিপ্লব'।

কিন্তু

নিয়োলিবারেলিজমের এই ঘনঘটা কালে 'বিপ্লব' শব্দটা ওবিস— বগলের চুলের মতো অশোভন অতিরিক্ত; খুঁজে পেতে হয় তাকে একটা ৩৬-২৪-৩৬ মাপের শব্দ। বাঙালির চিরদিনের ফ্যান্টাসি তাই নতুনতর এক শব্দে শোভিত হয়: 'পরিবর্তন'। পরিবর্তনে সব কিছু বদলে যাবে, বদলে যাওয়াটাই ভবিতব্য— শুধু তার নিজের আদিপনা ছাড়া।

বাঙালির বিপ্লবের গন্তব্য একটাই: সবাই, সবকিছু তার নিজের মতো হয়ে উঠবে। সমতা আর সাম্যের মানে তার কাছে হোলো কাতারে-কাতারে, লাখে-লাখে তার নিজের ক্লোন কিলবিল করবে। আর যারা অন্য রকম, অন্য বিশ্বাসের— তাদের সে 'কিল বিলের' মতো কচু কাটা করবে। কারণ তার স্বপ্নের মঙ্গল রাষ্ট্রে ভিন্ন মত মানেই বিদূষক, প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধককে টপকানো তার লক্ষ্য না কেননা সেজন্য কসরত করতে হবে— সে চায় কোনো এক শক্তিমান, যার দোষগুলো ঠিক তারই মতো কিন্তু গুণগুলো হবে পৌরাণিক— তিনি এসে এই প্রতিবন্ধক 'উপড়ে' দেবেন।

সে বাস করে সমাজে, সে বোঝে সমাজ এবং তার অস্তিত্ব সমাজে পোঁতা কিন্তু স্বপ্ন দেখে রাষ্ট্রের। সে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা বলে গুলিয়ে ফেলে। কেননা প্রয়োজন বোধ করার আগেই, পলিটি হয়ে ওঠার আগেই— সে পেয়ে গেছে একটা রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে তার নিজের অওকাদ হোলো প্রজাসুলভ, নাগরিকসুলভ না। নাগরিকের রাষ্ট্রে সুবিধা যেমন আছে, দায়ও আছে অনেক। প্রজার রাষ্ট্রে কোনো দায় থেকে না, থাকে শুধু কর্তব্য আর কিছু প্রিভিলেজ— দুটোই ঊর্ধ্বতনের ঠিক করে দেয়া। নাগরিকের রাষ্ট্র 'হয়ে ওঠার' জিনিস, সেখানে সে উপস্থিত থাকে ঔনার হিসেবে। প্রজার রাষ্ট্র 'করে দেয়ার' জিনিস, যেখানে সে উপস্থিত থাকে— স্বভাবতই— সুযোগ-সন্ধানী খেলোয়াড় হিসেবে।

সে কোনোদিনও নাগরিক হতে পারে না, সে হয় বাসিন্দা। বাসিন্দার ভাবজগতে প্রক্সিমিটি হোলো সব থেকে দৃশ্যমান নির্ণায়ক কেননা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমিত হোলে 'অপর' বাসিন্দা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই 'অপর' বাসিন্দা তার চোখে সংখ্যা থেকে মানুষ হয়ে ওঠে কেবলমাত্র ধর্ম কিংবা ভাষার দোহাই থেকে, কখনোই নাগরিকত্বের কারণে না। লিগাল কোডের দার্শনিক ব্যাখ্যা তার ভেতরে কোনো ধরনের ওভার-আর্চিং দিকনির্দেশনা হয়ে ওঠে না। সে বোঝেই না যে শাস্তির বাইরেও লিগাল কোডের একটা গন্তব্য আছে। যে কারণে বাঙালির একমাত্র রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী সর্বসম্মুখে বলতে পারেন যে একজন পূর্বতর প্রধানমন্ত্রীকে দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত। কারণ তার মনে রাষ্ট্র হোলো খুব বড় ধরনের একটা গ্রাম, যার ঢোকার ও বের হওয়ার মুখে খুব বড় একটা

মেঠো পথ আছে। যখন সে গ্রামের কেউ এমন কোনো অপরাধ করে যার ব্যাখ্যা গ্রামবাসীর জানা নেই তখন বয়োজ্যেষ্ঠরা তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিলে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস শুরু করবে বলে মনে করা হয়। এই মেঠো পথটার অপর প্রান্ত, যেটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, সেটা গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে 'বাস্তবতা' বটে কিন্তু 'বিবেচ্য' না।

এই অবিবেচ্যতাকে বরাদ্দ রেখে সে রাষ্ট্র গঠন করে, বিপ্লবের স্বপ্নও দেখে— স্পর্ধা মাত্রই 'অদ্ভুত', কিছু স্পর্ধা অদ্ভুততর। তা সেই বিপ্লব বস্তুটা কী?

বাঙালি কখনো এলাবোরেট স্বপ্ন দেখতে পারে না— তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। তার স্বপ্ন হোলো তাৎক্ষণিকতার স্বৈরাচার— অর্ধেক তার দেখা, তার অর্ধেক তার স্বপ্ন। আর সেই সিকিস্বপ্নের পুরোটাই হোলো ধ্বংসের ছক। সে এমন কোনো অলৌকিক কসরতের আরাধনা করে যার তোপে হাজির সুবিধাপ্রাপ্তরা সব 'নাই' হয়ে যাবে। এই নাই হয়ে যাওয়াটাও খুব মজার বিষয়। এক সময় সে মনে করতো যে এদের হত্যা করা উচিত— তাহলেই না বিপ্লবের ন্যায্যতা। এখনও যে সে অন্যরকমদের মৃত্যু চায় না, তা না; কিন্তু হত্যা করে পার পাওয়া আজকের দুনিয়ায় খুব কঠিন। তাই সে তার দৃশ্যকল্পকে একটু ঘষামাজা করেছে। এখন সে চায় এই ডার্টি জবটা রাষ্ট্রই করুক— আইন দিয়েই করুক। আইন যদি বলে যে তার প্রতিপক্ষের পাদ মারার অধিকার নেই, সে বিচলিত হয়ে যায় তার প্রতিপক্ষ পাদ মারলে, বিচার চেয়ে বসে আইন ভাঙার অপরাধে। আইনের উৎস ও ন্যায্যতা প্রশ্নে আলাভোলা কলোনিয়াল, মাথায় তেল দিয়ে সাতলানো চুলের সুবোধ বালক, কিন্তু আইন ভাঙ্গলে সাজা কী— সে প্রশ্নে একদম কামোচ্ছল তাগড়া পুরুষ— সতত উদগীরণমুখ।

তার কলোনিয়াল মাথার সব থেকে বড় চিহ্ন হোলো আইন-ফেটিশ। কলোনিয়াল মাথা মনে করে যে সব কিছুর জন্য আইন দরকার, পাদ মারা এবং পাদের থেকে রক্ষা পাওয়া— দুটোর জন্যেই আইনের প্রয়োজন আছে। কারণ সে সত্যি সত্যিই মনে করে যে আজকে যদি একজনের পাদ থেকে নিস্তার না পাওয়া যায়, কালকে তাহলে দশজনের পাদ থেকে কীভাবে রক্ষা করবো (কলোনিয়াল মন ঐকিক নিয়মে তুখোড়)? তার মন বলে, একজনের পাদ উপদ্রব— কিন্তু দশজনেরটা— বিপ্লব। কাজেই

আইন দাগা। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিচারপতিরা শক্তিমানের প্রতি পরমব্রতী; বিচার করার চেয়ে বিহিত করার দিকে তাদের ঝোঁকটা একটু বেশী। পোক্ত ব্যবস্থা আর কী!

গর্দভদের সংবিধানে সবসময় সর্বোচ্চ সংখ্যক আইন ও সংশোধনী থাকতে হয়। গর্দভরা নিরাপদ হওয়ার চেয়ে নিরুপদ্রব হওয়াকে বড় পাওয়া মনে করে।

যে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক সেটা হোলো কীভাবে আমরা আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েও আদিম গোত্রীয় চিন্তাকে প্রশ্রয় দেই? কীভাবে নাগরিক শেকড়হীনতার মাঝেও এতো সার্থকভাবে সামষ্টিক আদিপনাকে লালন করি? পশ্চিমের লাইফ স্টাইল আমাদের এতো প্রিয় অথচ পশ্চিমের লিবারেল থটস কেন আমাদের বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না?

এর উত্তর অন্তত আমার কাছে হোলো— ভাষা। লিঙ্গুইস্টিক রেলেটিভিটি বলে একটা হাইপোথিসিস আছে, যেখানে ধারণা করা হয় যে মানুষের ওয়ার্ল্ড ভিউ তার ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ একটা ভাষার গঠন তার ভাবনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। কুৎসিত সরলীকরণে বলা যায়, যা আপনার ভাষায় নেই— সেটা আপনার ভাবনায়ও নেই। যেমন ধরুন কোনো ভাষায় যদি ক্রিয়ার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল যদি না থেকে কেবল একটিই ক্রিয়া থাকে তাহলে সে ভাষার মানুষেরা 'সময়'কে আমাদের মতো করে নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সমন্বয় করে আলাদা করার ভাবনা পোষণ করবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে লিঙ্গুইস্টিক রেলেটিভিটির বিভিন্ন দাবী বিভিন্ন সময়ে ভাষাবিদরা নাকচ করেছেন কিন্তু সে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। ব্যক্তিগতভাবে, যখন আমি লিঙ্গুইস্টিক রেলেটিভিটির নামগন্ধও জানতাম না, তখনও এই একই উপসংহারে পৌছেছিলাম (আমি কোনো ভাষাবিদ নই এবং ভাষাতত্ত্বে যে আমার কোনো প্রশিক্ষণ নেই সেটা বলে রাখা ভালো)।

একটা ছোট্ট ও প্রায় অপ্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া যাক। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ অপর সমগোত্রীয়কে যে অপবাদটি ছুড়ে সবচেয়ে স্বস্তি বোধ করেন, আমার ধারণা, সেটা হোলো 'অসভ্য'। কিন্তু এই কটূক্তিতে কেউ মনোক্ষুণ্ন হয়েছেন এমন অপবাদ শোনা যায় না বললেই চলে।

মজার ব্যাপার হোলো দু'শ বছর আগে এভাবে যে কাওকে অভিযুক্ত করা যায় সে ধারণাটাই হাজির ছিলো না। তা কীভাবে এই শব্দটি মগজে ঠাই নিলো?

দীপেশ চক্রবর্তীর কাছেই শুনেছিলাম মনে হয়— উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষেরা প্রথম অনুধাবন করেন যে য়োরোপীয়ানরা যে অর্থে 'civilisation' শব্দটি ব্যবহার করেন সে অর্থ প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ তাদের স্থানীয় ভাষায় নেই। অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক, আইনী বিকাশ এবং মন ও মগজের উৎকর্ষ অর্থে যে civilisation— তার দ্যোতক কোনো শব্দ আমাদের নেই। তাহলে একটা শব্দ বানাতে হয়।

সংস্কৃতে সভ্য শব্দটার অর্থ হোলো 'সদস্য'। ছোটো বঙ্গে এই অর্থে শব্দটি এখনও ব্যবহৃত হয় (যেমন সংসদের সভ্য)। সদস্য অর্থটি মাথায় রেখে পার্টিসিপেন্ট এর এক্সটেনশান হিসেবে আমরা সভ্যতা শব্দটি আবিষ্কার করি এবং কৃত্রিমভাবে এই শব্দটির সীমানা নির্ধারণ করি য়োরোপীয়ানরা যে সীমানায় 'civilisation' ব্যবহার করেন, ঠিক সেই নিরিখে।

ইংরেজিতে civil থেকে civilisation এর উৎপত্তি। কিন্তু আমরা 'সভ্যতা' আবিষ্কারের পর দেখলাম যে, যে ব্যক্তি সভ্যতার অনুগামী, অর্থাৎ মন ও মগজের উৎকর্ষ যার হাসিল হয়েছে তাকে নির্দিষ্ট করার মতো কোনো শব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা আরেকটা কৃত্রিম শব্দ আবিষ্কার করলাম। যেহেতু আমরা civilisation এর মানে সভ্যতা নির্ধারণ করেই ফেলেছি সেহেতু civil মানে শিষ্টও। সুতরাং সভ্যর অর্থ হিসাবে 'সদস্য' থাকলো আবার 'সাধুজন'ও জুড়ে বসলো। প্রথমে একটা গোজামেলে শব্দ বানানো, তারপর সেই গোজামেলে শব্দকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরেকটি গোজামেলে শব্দের আবিষ্কার।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন 'অসভ্য' গালিটি শুনলে কারো গায়ে লাগে না।

কিন্তু প্রশ্নটি শুধু গালির না, আমরা কী অর্থে 'সভ্যতা' বুঝি তারও। একান্তই আমার ব্যক্তিগত ধারণা— আমাদের মনে 'সভ্যতা'র সাথে কোনো 'শর্তের' সংশ্লিষ্টতা নেই। আমাদের মনে সভ্যতার সীমানা নির্ধারিত হয়

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, সময় ও কংক্রীটের ব্যবহার দ্বারা। অর্থাৎ যে রাষ্ট্র যতো ধনী, যতো বেশীদিন ধরে ধনী এবং যারা যতো বেশীসংখ্যক প্রকাণ্ড ইমারত ও ব্রীজ তৈরি করেছে তাদের সভ্যতা ততো অগ্রসর। আমাদের কাছে সভ্যতার সাথে লিগাল ও মোরাল কোডের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, অনর্থকরী বড় আবিষ্কারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আর অন্যদিকে সভ্য মানে হোলো ভদ্র-মধ্যবিত্ত; কোনো গরীব মানুষ যতোই ভদ্র হোক, সে সভ্য হতে পারে না (সম্ভবত যেহেতু সে লুঙ্গি পরে বাইরে যায়)— আর বড়লোক সভ্য হোলে বাঙালি তাকে 'মহান' মেনে স্বস্তি পায়। তবে 'অসভ্য' হওয়ার এখতিয়ার মোটামুটি সবারই আছে। এই দিকটাতে বাঙালি খুবই গণতান্ত্রিক। মূলত মেয়েদের বুকের দিকে তাকালে, মলেস্ট করলে, কোনো মেয়ে উত্তেজনা ও ঈর্ষাবর্ধক কাপড় পরলে এবং সর্বোপরি কুরুচিপূর্ণ শব্দ (যেমন নুনু, ভোদা), গালাগাল (যেমন চুতিয়া) ও ইঙ্গিত প্রয়োগ করলে যে কেউ অসভ্য হতে পারেন।

সুবিধাপ্রাপ্তরা কখনো পরিবর্তন চায় না— স্বভাবতই। আর সুবিধাহীনের অভিমান সবার ওপর— সে বোঝে যে ইনসাফের অভাবে, বিদ্যমান পাওয়ার-স্ট্রাকচারের কারণেই সে সুবিধাহীন। তাই সে ধ্বংস দেখতে চায়। সে মনে করে যে ধ্বংসের পরে যা অবশিষ্ট তা অনিবার্যভাবে শুদ্ধ, প্রতিশ্রুত। এখানে, ঠিক এখানেই তার ভাবালুতার পরাক্রমে শব্দার্থের অভিস্রবণ হয়, শব্দগুলো ঠিক তার আবেগের মতো একে অন্যের সাথে মিলিয়ে যায়। সে ভুলে যায় যে ধ্বংস কেবল ধ্বংসের প্রতিশ্রুতিই বহন করে; ধ্বংসজাত সাম্যে কোনো অবশিষ্টের প্রতিশ্রুতি নেই।

ধ্বংসের আয়োজনে প্রয়োজন কেবল রাগ; কিন্তু সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রতিভা। প্রতিভার অভাবকে বাঙালি হতচ্ছাড়া ভেবেছে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। তাই ধ্বংসের পরের পর্যায়ে কী হবে এ নিয়ে তার কোনো ধারণা নেই, না থাকাটাকেও সে সঙ্গত মনে করে। কারণ: তার মাথায় সামষ্টিকতার অবিভেজ্যতা এসে ঠেকে সমাজে, রাষ্ট্রে না— সমাজ তো আর ঠিক ধ্বংস হয় না। তার সমাজবর্তী ভাবনা যে ধ্বংসমুখ উল্লাসের অন্তত অনুঘটক— এ কথা সে ভুলেও স্বীকার করবে না। এই অস্বীকারের যথার্থ কারণও আছে। ধ্বংসমুখ উল্লাস মানেই তো আর ধ্বংস না, আমি ধ্বংস চাই আর আমি ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নেবো— এ দুয়ের

মাঝে তো অনেক ফারাক। সত্যিই তো— ক্ষোভ পেকে ফল হবে, এমন তো কোনো চুক্তি নেই।

এই ভূ-খণ্ডের অধিবাসী মোটের ওপর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিকার— কালেক্টিভ ঔনারশীপ কী জিনিস তা বুঝে ওঠার আগেই বাঙালি একটা রাষ্ট্র পেয়ে গেছে। সে ব্যক্তি মালিকানা বোঝে, সরকারী মালিকানা বোঝে কিন্তু সামষ্টিক মালিকানা জিনিসটা কী, তা মোটেও বোঝে না। ভোগের একচ্ছত্র সুযোগ তার কাছে সামষ্টিক মালিকানার শীর্ষ শর্ত। একটা প্রাচীন সমাজ দীর্ঘদিন উপনিবেশ থাকার কারণে এবং তারপরে খুব দ্রুত পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণের কারণে তার জন্য সামষ্টিক মালিকানার কনসেপ্ট বোঝাটা কষ্টকর। য়োরোপীয়ান রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ভেতরের দর্শনের কথা বাদই দিলাম— সহজলভ্য, ইসলামী দর্শনের রুবুবিয়াত সম্বন্ধেও যদি বাঙালির ধারণা থাকতো; তাহলেও অন্তত তার মাঝে এমন বিচিত্র স্বভাবের উদ্গার হতো না।

স্বাধীনতা ছাড়া সে থাকতে পারে না কিন্তু রাষ্ট্র সে ডিজার্ভ করে না— এমন দুর্ভাগা জনগোষ্ঠীকে ঠাই দেয়ার পলিটিকাল এনটিটি তো পৃথিবীতে নেই।

তাই বলে তো আমরা অরাষ্ট্রীয় নই। বাংলাদেশ, আমাদেরই আছে। কিন্তু বিপ্লব না হোলে আমরা কি অভীষ্টে পৌছুতে পারবো? বাঙালির সামষ্টিক জীবনে সত্যিকারের উত্তুঙ্গস্পর্শী বিপ্লব কি কোনোদিনও সবকিছু ওলট-পালট করবে না? এর ছোটো উত্তর হোলো পৃথিবীতে বিপ্লব বলে আসলে কিছুই নেই। কখনো কখনো বিবর্তন খুব দ্রুত ঘটলে আমরা অভিজ্ঞতা আর শব্দের অভাবে তার নাম দেই বিপ্লব।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রতিটি জাতিরই কখনো না কখনো প্রয়োজন হয় বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার। আমরা দীর্ঘদিন সেই প্রয়োজনীয়তার ভেতরেই দিনাতিপাত করছি। অথচ এখানে বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও নেই। কেননা যেকোনো বিপ্লবের একেবারে প্রথম যে শর্ত সেটা বাংলার দেশে পুরোপুরি অসম্ভব। বিপ্লবের প্রায় একমাত্র শর্তটি হোলো পুরাতন ও ভবিষ্যতের মাঝে অনতিক্রম্য দেয়াল উঁচু করতে সম্মত হওয়া। অতীতের সাথে

এই যে বিচ্যুতি— আপনি মনে করতে পারেন যে তার প্রধান সঞ্চালক হোলো রাজনীতি। আমার অনুমান— এর প্রধান সঞ্চালক হোলো ভাষা ও পাবলিক মেমোরী।

অবশ্যই আমরা আওয়ামী লীগ থেকে নিস্তার পাবো, সেটা বিপ্লব না— স্বাভাবিক পরিবর্তন। বিপ্লব হোলো ভবিষ্যতে কেউ যেন— এমন কি তার নিজের পছন্দের দলটিও যেন কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ হতে না পারে— এবং হওয়ার চেষ্টা করলেও তাকে আটকে দেয়া— এই মানসিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া। আপনারা জানেন যে ১৯৭১ এ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ কোনো বিপ্লবে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। পাকিস্তান আমলের শীর্ষ পর্যায়ের এমন কোনো অপকর্ম ছিলো না যেটা বলবৎ রাখি নি আমরা বাংলাদেশ আমলে। বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পাকিস্তানীদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হই (যেমন নির্বিচার লুটপাট ও মেরিটোক্রেসির ওপরে স্বজনপ্রীতিকে স্থান দেয়া)। পরমতসহিষ্ণুতার কথা বললে আমি কেবল একটিই উদাহরণ দেবো: ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে বাড়ী ফিরতে পেরেছিলেন— বাড়ীতে স্ত্রী-সন্তানের সাথে ডিনার করতে পেরেছিলেন। আজকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতা কাছাকাছি কোনো আহবান করলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে জেলে ঢোকানো হবে পল্টন ময়দান থেকেই।

কীভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপরে ন্যায্যতাকে স্থান দিতে হয় এ সম্বন্ধে বাঙালির মাঝে কোনো ধরনের কনসেন্সাস তো নেইই— না থাকাটাকেও বিশেষ কাণ্ডজ্ঞানের বিষয় বলে বড়াই করে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ৭১ এ 'পাকিস্তান' শেষ করতে চান নি, কীভাবে একটি নতুন 'পাকিস্তানে' তারা নিজেরা একাই ভোগ করবেন সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা কিংবা প্রস্তুতি ছিলো না রাষ্ট্র কীভাবে *'হয়ে ওঠে'*। পাঞ্জাবীদের জায়গায় বাঙালি প্রতিস্থাপন করাকে বিপ্লব বলে না, বলে রাজনীতি। তাই ৭১-এ বাঙালির রাজনীতি জয়ী হয়েছিলো— এর বেশী কিছুই যে হয় নি সেটাই সত্যিকারের ট্র্যাজেডি।

না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। পৃথিবীর প্রতিটি বিপ্লব এক অর্থে ভাষার কারসাজি। প্রতিটি বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে সেই জনগোষ্ঠী এমন কিছু

নতুন শব্দ, এমন কিছু টার্মিনোলজি কিংবা পুরনো কিছু এক্সপ্রেশন এমন নতুন ভাবে হাজির হয়— শব্দগুলো আপনার মাথাকে এমনভাবে রিওয়্যার করে— যে নতুন ও পুরোনোর মাঝে একটি চূড়ান্ত ভেদরেখা না টানা ছাড়া কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

আপনি বিপ্লব করেন না, বিপ্লব আপনাকে করে।

আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে অতীতের সাথে বর্তমানের যে ইনসেসটুয়াস সম্পর্ক, তা ছেদ করতে না পারার একটা মূল কারণ হোলো তার সম্ভাবনারহিত ভাষা— যে ভাষায় উৎকীর্ণ অভিজ্ঞতা আপনার কানে ফিস ফিসিয়ে যায়, খুব বড় কোনো পরিবর্তনকে আত্মস্থ করার তর্জমা হোলো 'বিশ্বাসঘাতকতা'— শেকড়ের সাথে।

শেকড়কে রক্ষা করার এই বায়বীয় প্রকল্প যা মূলত অলস হয়ে থেকে যাওয়ার আগাম অজুহাত— সেই প্রকল্পে নিজেকে নিবেদন করে বাঙালি কেবল একটি কাজেই মনোনিবেশ করতে পারে শেষমেশ; সেটা হোলো তর্ক— টং দোকান থেকে ফেইসবুক— সর্বত্র। তর্কে জেতাকে বিপ্লবের অর্ধেক অর্জন বলে মনে করতে থাকাটাই তাই বাঙালির শীর্ষ অভীপ্সা।

বাঙালির বিপ্লব এমন কোথাও হয় তাই, হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তেও— যেখানে তার অক্ষমতা ছাড়া আর কেউ বসত গাড়ে নি।

২০১৯

শেকায়েতনামা

ইতিহাস এবং ইতিহাসের নাগরিক রোমন্থন— মানে Public Remembrance এক জিনিস না। ভাষা আন্দোলন নিঃসন্দেহে আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে '৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের একটা আধিপত্যবাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে না। সংখ্যার আনুকূল্যকে সম্মান জানিয়ে সে সময়ের খুবই ছোটো আরবান মিডল ক্লাসের একটা নতুন ভাষা শিক্ষা করে চাকরীক্ষেত্রে কমপীট করতে অনীহা প্রকাশের গণমুখী বিস্ফোরণ ছিলো ভাষা আন্দোলন— এর সাথে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কোনো যোগাযোগ নেই।

কিন্তু ষাট বছর ধরে আমরা ভাষা আন্দোলনকে যে ন্যারেটিভ সহকারে স্মরণ করেছি তা এক বিচিত্র প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আদাবগুলো আমি লক্ষ্য করেছি গভীরভাবে।

ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি তাই আমাদের ভাষা সবার থেকে আলাদা অথবা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু আমরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি সেহেতু আমাদের ভাষা মহান। এই মহান ভাষায় যারা কথা বলেন তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের একটা দায়িত্ব হোলো ভাষার 'শুদ্ধতাকে' রক্ষা করা— নদীর মতোন করে। শুদ্ধ মাত্রই পবিত্র— বাঙালির মনে; তাই সে ভাষার ওপর পবিত্রতা আরোপ করে। খেয়াল করবেন যে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা খালি পায়ে শহীদ মিনারের বেদীতে উঠি (কিন্তু ৭১-এর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে সাভার স্মৃতি সৌধে খালি পায়ে যাওয়া আবশ্যক না)— পূণ্যভূমিকে মানুষ যেভাবে অবগাহন করে। যা কিছু আপনি পবিত্র বলে ধরে নেন তার প্রায় প্রতিটিই আপনাকে আশ্রয়

দেয়, রক্ষা করে। Public Remembrance এর ভাষা আন্দোলনের সামনে দাঁড়ালে তাই নাগরিকরা এক বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও নিবেদন বোধ করে। আমাকে যদি বাংলা ভাষাকে একটা ছবি হিসেবে বর্ণনা করতে বলা হতো, আমি বলতাম— ২১শে ফেব্রুয়ারিতে 'বাংলা ভাষা' হোলো মাইকেলেঞ্জেলোর সিস্টীন চ্যাপেলে আঁকা ফ্রেস্কো 'The Creation of Adam' এর ঈশ্বরের মতোন— যার শাদা লম্বা দাড়ি আছে (পিতৃবৎ), যে মহানুভব ও রক্ষাকারী, যে একটু উঁচুতে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এডামের দিকে।

আমি মনে করি এ ধরনের অনুভব ও আচার বাংলা ভাষার বিন্দুমাত্র উপকার করে নি বরং ক্ষেত্রবিশেষে ভাষা আন্দোলনের যে Public Remembrance তা আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাষা কোনো 'পবিত্র' বিষয় না এবং ভাষার দূষণ বলে যে ধারণা আমাদের মাথায় চেপে ধরে বার্ষিক একবার, সেটা এক আজগুবি ধারণা। ভাষা একান্তই— আরেকবার বলবো— একান্তই 'অপবিত্র' জিনিস— ব্যাঙ্ক নোট যে অর্থে অপবিত্র, সে অর্থে। কোনো ভাষার উৎকর্ষের জন্য এমন 'অপবিত্র' হয়ে থাকতে পারাটা খুবই জরুরী।

আমরা প্রায়ই অনুযোগ করি যে আমাদের 'একটা' মানভাষা থাকা আবশ্যক যেটা সবাই বুঝবে। কিন্তু ভুলে যাই যে একটা ভাষার নিজের মধ্যেই অনেকগুলো মানভাষা থাকে। একটা সায়েন্টিফিক পেপারের ইংরেজি, সাহিত্যের ইংরেজি আর আইনী রায় লেখার ইংরেজির মধ্যে যে বিস্তর ফারাক আছে সেটাও আমরা ভুলে যাই। ধরা যাক আপনি একটি পরীক্ষায় কোনো একটা পর্যায়ে বরফের মধ্যে একটা প্লেটে কিছু cell মানে কোষ আধা ঘন্টা ইনকিউবেট করছেন। সাহিত্যের ইংরেজিতে cells were incubated in ice বললে কোনো ভুল হবে না কিন্তু সায়েন্টিফিক ইংরেজিতে আপনাকে বলতেই হবে যে cells were incubated on ice কারণ আপনার প্লেটটা ছিলো বরফের স্তূপের ওপরে, মধ্যে না।

এটা একটা অতি সাধারণ উদাহরণ কিন্তু এর একটা তাৎপর্য আছে। বাংলায় যেটাকে আমরা মান ভাষা বলি সেটা সাহিত্য করার জন্যে, কিংবা সাধারণ ভাব আদান-প্রদানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ভাষার ব্যবহার মানে

তো শুধু গল্প-উপন্যাস লেখা না, আপনাকে খুবই বিশেষায়িত যোগাযোগও করতে হবে। মনে রাখবেন যখনই আপনি বিশেষায়িত যোগাযোগ করবেন তখনই দুটো ঘটনা ঘটবে। এক: আপনি অনেক বেশী বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা শুরু করবেন এবং দুই: যে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ আপনি ব্যবহার করা শুরু করবেন সেগুলোর অর্থের স্পেকট্রাম সংক্ষিপ্ত।

উদাহরণ দেই: ধরা যাক আপনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার, কথা বলছেন আরেকজন ডিজাইনারের সাথে। আপনি ঝগড়া করছেন রীতিমতো, যে না এই ড্রেসটা ফ্রেঞ্চ ব্লু দিয়ে বানালে হবে না, বানাতে হবে কর্নফ্লাওয়ার ব্লু দিয়ে (দুটোই নীল রঙের শেড)। এবং আপনার জুনিয়রকে বকা দিচ্ছেন— I told you to press the trouser, not to iron it. সাধারণ মানুষের কাছে ফ্রেঞ্চ ব্লু আর কর্নফ্লাওয়ার ব্লু'র মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই কিন্তু একজন ডিজাইনারের কাছে পার্থক্যটা রাতদিন। তেমনিভাবে press the trouser মানে হোলো ইস্ত্রী গরম করে প্যান্টের ওপর একজায়গায় বসাবেন, চাপ দেবেন তারপর উঠিয়ে ফেলে আরেক জায়গায় বসাবেন, ইস্ত্রী ঘষে ঘষে আরেক জায়গায় নেবেন না (একটা চাদর ইস্ত্রী করতে হোলে যেমন একবার ইস্ত্রী বসিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব জায়গায় নিয়ে যান)।

লক্ষ্য করুন যে ইংরেজিতেও সাধারণ একজন মানুষের কাছে press the trouser এবং iron the trouser— এই দুই এক্সপ্রেশানে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের কোনো ফারাক নেই। কিন্তু ইস্ত্রী করা যার পেশা, সে এই বিশেষায়িত ক্রিয়া পদের সীমানাটা বুঝতে পারে।

প্রশ্ন হোলো, এই ধরনের বিশেষায়িত ভাষিক যোগাযোগের কোনো সুযোগ প্রমিত বাংলা ভাষা মানে যে ভাষায় জ্ঞানী-গুণী জনরা লেখালেখি করেন সে ভাষার আছে কি না?

আমার উত্তর হোলো— নেই। আমি এই আয়োজনে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে প্রমিত বাংলা ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা খুবই আটোসাটো মাধ্যম যার বিবর্তিত হওয়ার সক্ষমতা খুব কম। এরপরে আমার থিসিস হোলো যে ভাষাটাকে প্রমিত বাংলার দূষণকারী বলা হয় বাংলাদেশে, অর্থাৎ অপ্রমিত বাংলা, যে ভাষার প্রথম সফল লেখক হোলেন ব্রাত্য

রাইসু– সেই বাংলাকেই আমি মনে করি সম্ভাবনাময় বাংলা। আমি এও মনে করি যে এই 'ছোটলোকী' বাংলাই কেবল পারবে বাংলা ভাষার প্রসার ঘটাতে এবং এ কাজটি করতে হোলে প্রয়োজন হবে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমকে ইংরেজি করা।

আপনার মনে হতে পারে যে আমি অনেক গুলো আজগুবি এবং স্ববিরোধী কথা বলছি। একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিছু প্রশ্ন আপনারও হতে পারে।

৭০ পরবর্তী বাংলাদেশকে বাংলা মাধ্যম পর্ব বলা যায় কেননা এই সময়ে স্কুলের ল্যাংগুয়েজ অফ ইন্সট্রাকশান ইংরেজি থেকে বদলে বাংলা করা হয়। এই পর্বের দুজন বিখ্যাত বাংলা ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও হুমায়ূন আহমেদ। প্রথম জনকে বেশীরভাগ পাঠক সিরিয়াস লেখক মনে করেন এবং দ্বিতীয় জন জনপ্রিয় লেখক। আমি এ দুজনের যেকোনো দুটো উপন্যাস নিয়ে প্রথম দশ হাজার শব্দের মধ্যে শুধুমাত্র ক্রিয়াপদগুলোকে দাগ দেয়ার অনুরোধ করবো এবং সমসাময়িক ইংরেজি ভাষার দুজন লেখক সালমান রুশদী এবং জেফরি আর্চারের যেকোনো দুটো বই নিয়ে একই কাজ করার অনুরোধ করবো। তারপর বাংলা ও ইংরেজির ক্রিয়াপদ নিয়ে সামান্য তুলনা করুন।

আপনি দুটো জিনিস দেখতে পাবেন। সম্ভবত উক্ত দুই বাংলা লেখকের বই এ আপনি এমন একটা ক্রিয়াপদও পাবেন না যেটা রবীন্দ্রনাথ পড়লে বুঝতেন না কিংবা রবীন্দ্রনাথের সময়ে ব্যবহার করা ক্রিয়াপদটার মানে এখন এতোটাই বদলে গেছে যে তিনি এই মুহূর্তে পড়লে তার পাঠোদ্ধার করতে পারতেন না। শুধু তাই না, আধুনিক জীবন-যাপন জনিত কিছু বিশেষ্য ছাড়া (যেমন কম্পিউটার, ফ্যাক্স ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথ প্রায় পুরো বইই সঠিক অর্থে বুঝতে পারতেন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আপনি লক্ষ্য করবেন সেটা হোলো প্রমিত বাংলায় ক্রিয়াপদের অপ্রতুলতা। প্রমিত বাংলা ক্রিয়াপদের জগৎটা একটা খাটি অচলায়তন। ইংরেজি ভাষায় নিত্য নতুন ক্রিয়াপদ ঢুকছে এবং প্রচলিত ক্রিয়াপদের মানে বদলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কারণ আমাদের জীবন-যাপন বদলে যাচ্ছে।

উদাহরণ দেবো? Sexting, Xeroxed, Hoovered, trending, skateboarding, tweeting, speed-dating এই ক্রিয়াপদগুলো একেবারেই নতুন। Phrasal Verb ও বদলে যাচ্ছে দ্রুত। বিশ বছর আগে bump off শব্দদ্বয়ের কেবল একটাই মানে ছিলো— কাওকে মেরে ফেলার একটা ইনফরমাল এক্সপ্রেশান। কিন্তু এখন কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের সাথে যোগাযোগ হুট করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে bump off বলা হয়। ইংরেজি phrase এর ক্ষেত্রে যেহেতু কিছু অলিখিত সূত্র আছে সেগুলো ধরে অহরহই নতুন ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন ধরুন dumb down বলতে আপনি বোঝাতে চাইছেন— ভোদাইদের জন্য এই কঠিন ব্যাপারটা আমি সহজ করে প্রকাশ করলাম। এটা পুরনো এক্সপ্রেশান কিন্তু এখন dumb up ও ব্যবহার হচ্ছে। এর মানে হোলো সাধারণ একটা বিষয়কে খুব ইন্টেলেকচুয়াল প্রতিপন্ন করা— খেলনা প্লেনকে ড্রোন প্রমাণ করে বিশাল একটা লেখা লিখতে হোলে যে কাজটা আপনাকে করতে হবে। তেমনিভাবে তৈরি হয়েছে sex up বা sex down।

খেয়াল করুন যে আধুনিক জীবনে আমরা এমন শত শত কাজ করছি যেগুলো ৫০ বছর আগেও কল্পনা করা যেতো না এবং সেগুলো প্রকাশের কোনো যুৎসই শব্দ আপনার কাছে নেই। আজকের ছেলেমেয়েরা যে 'গো আউট', 'ডেটিং', 'ফাকায়' শব্দগুলোকে ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করে এর কারণ তাদের কাছে হোলো— বাংলা ভাষায় তাদের সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দভাণ্ডার নেই।

গরু আপনি জবাই (Slaughter) করেন ঠিক আছে কিন্তু আমি যে পরীক্ষার জন্য ইদুর 'ব্যবহার' করে মেরে ফেলছি যেটাকে ইংরেজিতে অপরাধ বোধ কমানোর জন্য বলা হচ্ছে culling কিংবা একদিন ইদুরের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলেছিলাম ভুল করে— যেটাকে বলা হয় sever বা decapitate, সেটাকে বাংলায় কীভাবে প্রকাশ করবেন? আমি তো আর ইদুর 'হত্যা' করি না, কিংবা এমন স্যাডিস্টও নই যে ইদুর 'মেরেই' আমার সুখ।

অনেকেই মনে করেন যে 'ল্যাবে ইদুর মারি' বললেই শ্রোতা বুঝে নেবে যে পরীক্ষার জন্য ইদুর ব্যবহার করে, মেরে তারপর ফেলে দেয়া হচ্ছে।

ঠিক আছে। ইদুরের ক্ষেত্রে হয়তো আপনি সঠিক অর্থই গ্রহণ করতেন কিন্তু যদি আমি ল্যাবে গরু 'মারতাম' তাহলে কিন্তু 'মারা' দিয়ে অন্য অর্থও করা যেতো।

এই সমস্যা শুধু ক্রিয়াপদ নিয়ে না, বিশেষ্য নিয়েও। আমি একটা বিজ্ঞানসম্মত (কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলা যাবে না আপাতত) পরীক্ষার কথা চিন্তা করেছিলাম। সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলো 'কন্ট্রোল'। আমাদের তাই প্রয়োজন এমন বস্তু (বিশেষ্য) যেটাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইন্টারপ্রেট করার সুযোগ আছে। আবার এমন জিনিস দিলে হবে না যেটা সবার বোঝার কথা না। আপনি গাড়ী হিসেবে Jaguar XJ দেখিয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন যে এটা কি— সবাই মোক্ষম উত্তরটি দিতে পারবে না— পারার কথাও না।

সবার বোঝার কথা— অন্তত দেখার কথা এমন একটা বিষয় হতে পারে 'রং' ও তার নাম। যেহেতু আমরা সবাই এই রংগুলোর মুখোমুখি হই অহরহ, সেহেতু কেউ বলতে পারবেন না যে আমি তো এই বিশেষ্যর সাথে পরিচিত নই।

এই পরীক্ষায় আমি মোট ৬টা কালার সোয়াচ দিয়েছিলাম; রংগুলো ছিলো— য়েলো ওকার, ক্রোম য়েলো, বার্ন্ট সিয়েনা, ভার্মিলিওন, লাইলাক ও ভায়োলেট। পরীক্ষাটি যদি আপনি করতে চান— যে কাওকে আপনি এই ৬টি রং দেখাবেন (অবশ্যই রঙের নামগুলো দেখাবেন না) কিন্তু একসাথে একটির বেশী রং দেখাবেন না এবং এই ৬টি রঙের মধ্যে আপনার ইচ্ছে মতোন আরো বেশ কয়েকটি কালার সোয়াচ ঢুকিয়ে দেবেন (পরপর দেখালে ক্লু পেয়ে যাবে)। শুধু লক্ষ্য রাখবেন এই ৬টা রঙের নাম পরীক্ষার্থী কী বলছে?

আমার অভিজ্ঞতা কী বলি। বেশীরভাগ মানুষ না বলে দিলে রঙের নাম ইংরেজিতে বলা শুরু করে। বাংলায় অনেকেই য়েলো ওকার ও ক্রোম য়েলো দুটোকেই হলুদ বলেন। যদিও য়েলো ওকারকে অন্তত বাদামী বলা যায়। বার্ন্ট সিয়েনাকে খয়েরী বলা যায়, কিন্তু সবাই বলেন লাল। আবার যারা বার্ন্ট সিয়েনাকে লাল বলেন মাঝখানে আরো কয়েকটা রং দেখিয়ে মনোযোগ নষ্ট করলে ভার্মিলিওনকেও লালই বলেন। বাংলায় বললে

প্রায় সবাইই লাইলাক ও ভায়োলেটকে বেগুনী বলেন (হালকা আর গাঢ় বেগুনী)।

একটু খেয়াল করুন পাঠক! এই রংগুলোর একদম সঠিক নাম আর্টিস্ট ও ডিজাইনার ছাড়া প্রায় কেউই বলতে পারবেন না, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি বেছে বেছে এমন রং নিয়েছি যেগুলো মোটামুটি সবাইই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন শুধুমাত্র লাইলাক ছাড়া। বাদামী, হলুদ, খয়েরী, কমলা/লাল, লাইলাক/ল্যাভেন্ডার/মভ ও বেগুনী। অন্তত ৫টো রঙের নাম কিন্তু চলনসই ভাবে বাংলা দিয়েই বলা যায় কিন্তু অনেকেই বার্ন্ট সিয়েনা ও ভার্মিলিওন দুটোকেই লাল বলেন এবং লাইলাক ও ভায়োলেট দুটোকেই বেগুনী বলেন।

এর কারণ কী?

অনেক ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। রং নিয়ে খুব সফিস্টিকেটেড পরীক্ষা হয় যেগুলো আমার আয়ত্তের বাইরে। তাছাড়া এটাকে পরীক্ষা না বলে পর্যবেক্ষণ বলাটাই ভালো— আমি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে পর্যবেক্ষণটা চালিয়েছি। কিন্তু কয়েকটা প্যাটার্ন আমরা ধরতে পারি এবং হয়তো কিছু এডুকেটেড গেস করলে অপরাধ হবে না। যে ব্যক্তি খয়েরীকে লাল বলছেন তিনি কিন্তু দেখছেন খয়েরীই কিন্তু বলছেন লাল— কেননা তিনি রংটাকে প্রকাশ করার সময়ে মনে করছেন যে লাল রঙের ব্যাপ্তি এতোটাই বড় যে খয়েরীকে লাল বললে অসুবিধা নাই (এটা আমার ব্যাখ্যা)। তার মাথায় একেকটা বিশেষ্যর ব্যাপ্তি এতোটাই বড় যে আরেকটা বিশেষ্যর সাথে ওভারল্যাপ করাটাকে তিনি 'ভুল' মনে করেন না। হোমারের ইলিয়াড রচনার সময়ে গ্রীক ভাষায় 'নীল' রঙের সমার্থক কোনো শব্দ ছিলো না। সে হিসেবে লাইলাক রঙটা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য 'অপরিচিত' হতে পারে কিন্তু বাকী রংগুলোর নাম কিন্তু বাংলায় আছে। তাহলেও কেন সে একই নাম দিয়ে দুটো ভিন্ন রং প্রকাশ করে?

আমার কাছে মনে হয় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যেহেতু সীমিত সেহেতু বাংলা ভাষাভাষীরা ছোটোবেলা থেকেই একই শব্দ দিয়ে অনেকগুলো অর্থ বোঝানোর একটা বিদ্যা আয়ত্ত করে। এই কাজটা আমরা করি নিজের

অজান্তেই। যার ফলে বাংলা ভাষার শব্দের পরিধি ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এই 'কাজ চালানোর' একটা বড় সমস্যা আছে। বাংলা শব্দবিশারদ কলিম খান দেখিয়েছেন যে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসারে 'তীর্থ' শব্দটির মোট ৪২ টি অর্থ করা যায় মধ্যে যোনী, নারী, রতিস্থান/ক্রীড়াস্থান, পাত্র/সৎপাত্র, আগুন, খেয়াঘাট এমন কি মন্ত্রীও আছে। আমি বলছি না, এমন কি সুপারিশও করছি না যে একটা শব্দের কেবল একটাই মানে থাকা উচিত (সেটা ভাষার দীনতা) কিন্তু তাই বলে ... কোথায় আগুন, কোথায় যোনী (তামাশাটা দেখুন– এটাও বাঙালির তীর্থ) আর কোথায় মন্ত্রী? মানেগুলো কি কাছাকাছি?

লেখক যে অর্থে তীর্থ শব্দটি ব্যবহার করছেন পাঠক সে অর্থে শব্দটি গ্রহণ করবেন কি না– এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কি?

এটা আমাদের ব্যবহারিক বাংলারও একটা মূল সমস্যা। আমাদের কলহপ্রিয়তার একটা মূল কারণ আমার কাছে মনে হয় বাংলা শব্দার্থের স্পেকট্রাম খুব বড় হওয়া। আমি বহু ঝগড়া প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে এক পক্ষ যে অর্থে ভাব প্রকাশ করছে গ্রহীতা সে অর্থে ভাবটা নিচ্ছে না, কারণ গ্রহীতার পক্ষে শব্দটার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ আছে। সংসদে চুদুর বুদুর শব্দদ্বয়ের ব্যবহার নিয়ে যে বিরাট ঝগড়া হয়েছিলো বছর খানেক আগে তার মূল কারণও এটি। কেউই জানে না এই শব্দের সীমানা আসলে কোথায় শেষ হয়? যেহেতু শব্দদ্বয় শুরুর দু-অক্ষর চ এবং দ ধ্বনি-তাত্ত্বিকভাবে 'চোদা' শব্দের কাছাকাছি সেহেতু গ্রহীতা না জেনে ধরেই নিয়েছিলেন যে শব্দটি অশ্লীল।

এই আলোচনা আমি অনেকের সাথেই করেছি এবং একটি প্রসঙ্গ বারবারই এসেছে। অনেকেই মনে করেন যে কথোপকথনের ভাষা আর লেখার ভাষা ঠিক এক না। লেখার ভাষায় বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের অভাব থাকলেও বলার ভাষায়– অনেকেই মনে করেন যে পার্থক্য খুব বেশী নেই। আমি তা মনে করি না বরং আমার ধারণা বলার ভাষায় আমাদের শব্দভাণ্ডার আরো কম। আমার এই ধারণা সঠিক কি না তার জন্য একটা তুলনার আয়োজন করি।

আমার বিচারে বাংলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ টিভি সিরিয়াল হোলো বহুব্রীহি আর ইংরেজি ভাষায় Twin Peaks (এবং দ্বিতীয় সেরা হোলো Breaking Bad)। আমার রুচির সাথে আপনারটা মিলবে না জানি— প্রয়োজনও নেই— কিন্তু এই তিনটি সিরিয়ালই যে সুলিখিত সে কথা অন্তত কেউ অস্বীকার করবে না। আমার কৌতুহল মেটানোর জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে বহুব্রীহির একটি পর্ব (প্রথম পর্ব) এবং Breaking Bad এর একটি পর্ব (3rd Season, 1st episode) নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করি। আমার আগ্রহ বাংলা এবং ইংরেজি দু ভাষায় মোটামুটি ৪৫ মিনিটের লিখিত ও এডিটেড কথোপকথনে মোট কতোগুলো Unique Verb বা অনন্য ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রথমে আমি দুই ভাষার দুটো পর্বে সর্বমোট কতোগুলো শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো সেটা গুনেছি। বহুব্রীহি ৫২ মিনিটের প্রথম পর্বে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৪৯২১টি। অন্যদিকে Breaking Bad, 3rd Season, 1st episod এর ৪৭ মিনিটে সর্বমোট ৩৫৭৩টি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে (বাঙালির টিভি শোতে কথা বলানো হয় খুবই বেশী!)। এরপরে আমি দেখেছি উভয় মাধ্যমে মোট কতোগুলো Unique Verb ব্যবহৃত হয়েছে? ইংরেজিতে Auxiliary Verb আমি গুনি নি এবং একই Verb এর কর্তা ও কাল ভেদের পার্থক্যকে আমি একটাই গুনেছি, আলাদা করি নি। Eat, He eats, Pinkman ate, Saul was eating— এই চার প্রকাশে কেবল একটাই মূল ক্রিয়াপদ আছে— আর সেটা হোলো eat। ৩৫৭৩টি শব্দের মধ্যে যতোবার যেভাবেই eat শব্দটি আসুক আমি গুনেছি কেবল একবারই, একটা Unique Verb হিসেবে।

ঠিক এমনিভাবে বাংলাতেও আমি পারি, সে পারে, রহিম পারছে, ফাহামবাগই পেরেছিলেন— এই চারটি বাক্যে আমি একটি মূল ক্রিয়াপদের চারটি ভিন্ন রূপ দেখেছি মাত্র। তাই গোনার সময়ে আমি গুনেছি একটি ক্রিয়াপদ: পারা। বহুব্রীহির এই পর্বে চারটা ইংরেজি ক্রিয়াপদও আছে যেগুলো হোলো গেট, গোয়িং, স্টার্টিং এবং মিক্স আপ। সে সাথে আছে 'অপ্রমিত' ক্রিয়াপদ যেমন জিগানো। আমি এগুলোকে অনন্য ক্রিয়াপদ হিসেবেই গুনেছি তবে 'করেছি', 'করি' এবং 'কইরেন' কে শুধুমাত্র 'করা' ক্রিয়াপদ হিসেবে গুনেছি।

বলে রাখা ভালো যে বহুব্রীহির কোনো অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট নেটে নেই যেটা Breaking Bad এর আছে। যেহেতু পুরো বহুব্রীহি শুনে লেখা সেহেতু ছোটখাটো কিছু ভুল থাকতে পারে— এবং ক্রিয়াপদের গণনায়ও কিছু ভুল থাকা অসম্ভব না।

Breaking Bad এর ৩৫৭৩টি শব্দের মধ্যে মোট Unique Verb ব্যবহৃত হয়েছে ১৭০টি, শতকরার বিচারে এই পর্বের কথোপকথনে সাকুল্যে ৪.৭৫% শব্দ হোলো Unique Verb। অন্যদিকে বহুব্রীহির ৪৯২১টি শব্দের মধ্যে মোট Unique Verb ব্যবহৃত হয়েছে ৮৫টি, শতকরায় ১.৭২%। অঙ্কের হিসেবে ইংরেজি কথোপকথনে বাংলার চেয়ে ২.৭ গুণ বেশী অনন্য ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে এই উদাহরণে।

কোনো উৎসাহী পাঠক চাইলে Pronoun ও Proper Noun বাদ দিয়ে শুধুমাত্র Unique Noun নিয়েও কাজ করতে পারেন, আমার কাছে দুটো স্ক্রিপ্টই আছে। আমার ধারণা যে ২.৭ গুণ না হোলেও ইংরেজি কথোপকথনে Unique Noun ও ব্যবহার হয় বাংলার চেয়ে বেশী।

বাংলার শব্দভাণ্ডার যে সীমিত এটা নিয়ে সম্ভবত কোনো তর্কের অবকাশ নেই। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোলো বাংলা ভাষায় শব্দভাণ্ডারের যে দীনতা এর দায়ভার কি প্রমিত বাংলার? এবং এই অপ্রতুলতা কি আমাদের কোনো ক্ষতি করে?

হ্যা, আমি মনে করি যে বাংলা শব্দভাণ্ডারের দীনতার সাথে প্রমিত বাংলার সরাসরি যোগাযোগ আছে। প্রমিত বাংলা একান্তই শুদ্ধবাদী এবং শব্দের জন্য সে তৎসম ভাবাপন্ন। অর্থাৎ শেকড়ে সংস্কৃত শব্দের ছিটেফোটা না থাকলে প্রমিত বাংলা আড়ষ্টতা বোধ করে— প্রমিত বাংলা উচ্ছল, প্রাণবন্ত ও গ্রহণবাদী না— এবং আজুড়ে অভিভাবকত্বে এই ভাষা স্থবির হয়ে পড়েছে। ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেকড়ের দিকে তাকিয়ে থাকা কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান না (শেকড় নিজে এই কাজটা করে না— সে যেদিকেই পুষ্টি পায় সেদিকেই যাওয়া শুরু করে)— এর মাঝে নেই কোনো মহত্ত্ব, নেই কোনো পবিত্রতা এবং অবশ্যই নেই কোনো আক্কেল-বুদ্ধি।

এবং হ্যা, শব্দভাণ্ডারের দীনতা আমাদের ক্ষতি করে। আপনি যদি প্রচুর শব্দ না জানেন, যদি শব্দের সীমানা না জানেন তাহলে প্রথমত আপনার

চিন্তা প্রসারিত হবে না এবং দ্বিতীয়ত আপনার চিন্তা ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে আপস করতে বাধ্য হবেন। আমি এই প্রসঙ্গে আগে একটি প্রবন্ধে যা লিখেছি সেটা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

"মৌলিক কিছু অনুভূতি ছাড়া মানুষের ভাবনা ভাষা নিরপেক্ষ না। খিদে লাগার প্রকাশ ইংরেজ, আরব কিংবা বাঙালি সবার জন্যেই এক, কিন্তু জটিলতর কিংবা বিমূর্ত কোনো বিষয় (যেমন বিজ্ঞান বা দর্শন) নিয়ে চিন্তা শুরু করলে দেখা যায় যে সেটা আপনার জানা শব্দগুলোকে ঘিরেই বাড়তে শুরু করে। আমাদের অনুভূতি ভাষাতীত হতে পারে কিন্তু ভাবনা বেশীরভাগ সময়ই না। বরং শব্দই ধরে রাখে চিন্তাকে, সূক্ষ্মতর চিন্তাকে। তাই একজন লেখক একটি নির্দিষ্ট ভাষায় শুধু লেখেনই না ভাবেনও বটে। নীরদ চৌধুরী এ কারণেই বলেছিলেন যে তিনি যখন ইংরেজিতে লেখেন ভুলে যান যে তিনি বাংলা জানেন এবং যখন বাংলা লেখেন তখন ভুলে যান যে তিনি ইংরেজি জানেন। ভাষার সাথে ভাবনার এই গাঁট-ছড়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, যে শব্দ আপনার জানা ভাষায় নেই সেই শব্দের দ্যোতক ভাবনা আপনার মগজে সহজে আসবে না (সবসময় না যদিও)। আপনারা যারা কোরান পড়েছেন তারা সম্ভবত 'আব্দ' শব্দটা পেয়েছেন কখনো-সখনো (এই লেখকের মধ্যনামেও শব্দটি পাওয়া যাবে)। বাংলা অনুবাদে শব্দটিকে লেখা হয় দাস কিংবা গোলাম এবং ইংরেজিতে Servant অথবা Slave। দাস কিংবা Servant তার কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক আশা করে; অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে পারিশ্রমিক পাবে বলেই দাস তার কর্তব্য পালন করে। 'আব্দ'-এর দাসত্বে কিন্তু আরাধ্য পারিশ্রমিকের এই আবশ্যিক শর্তটি নেই। সে দাসত্ব করে ভালোবেসে। এই কনসেপ্টটি যদি আপনার মাথায়ই সর্বপ্রথম আসতো এবং প্রকাশ করতে হতো বাংলায় কিংবা ইংরেজিতে, কীইবা শব্দ ছিলো আপনার মজুদে?"

বাংলা ভাষার এই অপ্রতুলতার কি কোনো সমাধান আছে? ভাষা কোনো মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন না যে চাইলেন আর দু বছরের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি বদল করে প্রফিট করে ফেলবেন। তবে এমনও না যে কোনোদিনও এই অভাব পূরণ করার না। দ্বিতীয় পর্বে (শিরোনাম: অপ্রমিত) এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। কিন্তু প্রথমে, আমাদের ভাষার যে সব সমস্যা অন্তর্নিহিত সে প্রসঙ্গে একমত হোলে কাজের কাজ হয়—

এবং জানতে হবে যে অজ্ঞতা জনিত উচ্ছ্বাস ও আহ্লাদ কেবল শিশুদেরই কাজে দেয়, আর কারো নয়।

পুনশ্চ: এই লেখার জন্য আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন মারুফ আল্লাম নামের এক সহৃদয় বন্ধু— তিনি পুরো বহুব্রীহি আমাকে বাংলায় টাইপ করে দিয়েছেন। জ্যোতি রহমান এবং শায়ান এস খানের কাছেও আমি ঋণী।

২০১৪

অপ্রমিত

এক

কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন যে আপনি ১৯১৪ সালের কোলকাতার তরুণ। খুব মেধাবী, বয়স ১৮।

আপনি পড়াশোনায় ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হবেন। আপনার বাবা মাঝারি মাপের একজন জমিদার কিংবা জমিদারির সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যে পড়াশোনায় ভালো এর মূল কারণ হোলো আপনার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যেটা পুরো বাংলার ৯০ ভাগ ১৮ বছর বয়স্কর নেই, আর সেটা হোলো অবসর— পড়ার জন্য।

পেশা বলতে আপনার আছে কেবল দুটো অপশন: ওকালতি আর বেশ্যাবৃত্তি (নীরদ চৌধুরী থেকে ধার করে একটু মশকরা করলাম, সেকালে 'পেশা' শব্দটার যে মানে ছিলো এখন তার অনেকটুকুই পাল্টে গেছে)। যেহেতু আপনি মেধাবী, পরিবার শিক্ষিত, আমি ধারণা করছি আপনি ব্যারিস্টার হওয়াটাকে জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে ধরে নিয়েছেন।

আপনি ১২ বছর পড়ালেখা করেছেন মূলত ইংরেজি মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজিতেই পড়বেন, ওকালতি যে করবেন সেখানে দলিল দস্তাবেজের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ফার্সি মিশ্রিত বাংলা আছে যদিও (৮০ বছর আগে সরকারী কাজ কর্ম সব ফার্সিতেই হতো) কিন্তু উচ্চ আদালতে (ব্যারিস্টারী পাশ করে যেখানে আপনি ঢু মারবেন) ইংরেজি ছাড়া কোনো গতি নেই। মক্কেলের সাথে বাংলায় কথা বলা ছাড়া বাংলা ভাষার তেমন কোনো ব্যবহার নেই আপনার পেশায়।

তারপরও ভালো বাংলা জানার ব্যাপক ইনসেনটিভ আছে আপনার— সত্যিই ব্যাপক।

এলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কোনো অস্তিত্ব নেই। আজকের হিসাবে এন্টারটেইনমেন্ট বলতে আছে বইপত্র আর মাঝে মধ্যে নাটক। গ্রামোফোন এসেছে মাত্র তের বছর— হিন্দুস্তানী গানের রেকর্ড করে প্রথম বিখ্যাত হয়েছেন গওহার জান মাত্র সাত-আট বছর আগে। যেহেতু তখনও গ্রামোফোন বেশ দামী এবং রেকর্ডের দামও মনে হয় কম না (গওহার জান প্রথম রেকর্ডিং এর জন্য পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন ৩০০০ রুপি— সোনার দাম দিয়ে এডজাস্ট করলে অন্তত ৬০ লক্ষ টাকা হবে এই মুহূর্তে)— গ্রামোফোন আপনার বাড়ীতে নাও থাকতে পারে। তওয়ায়েফ আপনার এফোর্ড করতে না পারারই কথা। যদিও সঞ্জয় দত্তের নানী জাদ্দান বাঈ (গুজব আছে এই মহিলা নাকি মতিলাল নেহেরুর প্রেমের সন্তান) এতোই বিখ্যাত যে ঢাকার মতো ছোটো শহরেও তার পোস্টার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তওয়ায়েফদের কোঠায় গিয়ে বিনোদিত হতে হোলে অর্থবিত্ত ও প্রতিপত্তি লাগে— সেটা এখনও আপনার হয় নি। কাজেই সন্ধ্যা বেলায় বিনোদন বলতে হয় নানান ধরনের বই পড়া নয়তো এই বই নিয়েই আলোচনা করা, বন্ধুবান্ধবদের সাথে। বয়স আরেকটু বেশী হোলে আপনি হয়তো প্রেমিকা পুষবেন কিন্তু সেটা এখনই না।

তখনও পার্টিসিপেটোরী এলেকশান শুরু হয় নি ভারতে, কাজেই পলিটিশিয়ানরা তখনও হাটে ঘাটে মাঠে চাড়া দিয়ে ওঠে নি। আপনি যদি কলকাতার who's who নিয়ে একটু গবেষণা করেন দেখবেন যে হয় এরা জমিদারীর সাথে সম্পৃক্ত, নয়তো লেখালেখি, শিক্ষক, ডাক্তার আর উকিল। এবং এটা কিন্তু খুবই ছোটো একটা সার্কেল— খুব বেশী হোলে দশ হাজার মানুষের সার্কেল। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও মুখ্যত একজন লেখক (তার রচনাসমগ্র ৫০ হাজার পৃষ্ঠার)। আপনি যদি তখনকার কোলকাতার ওপিনিয়ন মেকার হতে চান, সমাজে যদি একটু গুরুত্ব আশা করেন এবং যদি অমরত্বের প্রতি আপনার একটু দুর্বলতা থেকে থাকে— সত্যি বলতে কি খুব ভালো বাংলা জানা ছাড়া আপনার তেমন কোনোই বিকল্প নেই (অন্তত জানতে হবে, না লিখলেও চলবে)। আপনি যদি পত্রিকায় লেখালেখি না করেন কিংবা পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করতে

না পারেন আপনার সাথে হরিদাস পালের খুব বেশী পার্থক্য নেই। সময়টা একটু অদ্ভুত— লেখক ও পণ্ডিতরা তখন সত্যিই রকস্টার। যারা আপনার চোখে গুরুত্বপূর্ণ— অর্থাৎ সমাজের ব্রাইট মাইন্ডস— এর প্রায় সবাইই ভালো বাংলা জানেন।

ফাস্ট ফরোয়ার্ড টু ২০১৪

আজকে ভালো বাংলা জানার যে 'প্রয়োজনীয়তা' সেটা প্রায় শূণ্যতে নেমে এসেছে। ১৮ বছরের কোনো তরুণের যারা জীবিত হিরো তাদের প্রায় কেউই ভালো বাংলা জানেন না। আমার জানামতে বাংলাদেশে এই ভাষার সর্বশেষ যে ব্যক্তিটি শুধুমাত্র লিখে জীবনধারণ করতেন সেই হুমায়ূন আহমেদও চলে গিয়েছেন। সাংবাদিক ছাড়া আমাদের এই দেশে এ মুহূর্তে সম্ভবত এমন একজনও নেই যিনি শুধুমাত্র লেখালেখি করে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে আছেন।

ডিলেমাটা লক্ষ্য করুন। একশ বছর আগে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহরে পেশাগত ভাবে ইংরেজি জানা আবশ্যক হোলেও— সামাজিক গুরুত্ব পেতে হোলে ভালো বাংলা না জানার তেমন কোনো উপায়ই ছিলো না। আর এখন বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরে ভালো বাংলা জানার তেমন কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং ভালো ইংরেজি জানলে আপনার সামাজিক ও পেশাগত— দু দিক দিয়েই পোয়াবারো।

যারা আপনার সময়ের ব্রাইট মাইন্ড— তারা প্রায় সবাইই ভালো ইংরেজি শেখা নয়তো ব্যবহার করায় ব্যস্ত।

দুই

মানুষ চিরকালই প্রয়োজনের কারণে ভাষা আয়ত্ত করেছে। এখানে দুটো প্রয়োজন আছে। একটা হোলো আনুভূমিক প্রসার অর্থাৎ একদম মৌলিক ভাব প্রকাশ— দোকানীর সাথে আলাপ, রিক্সাঅলার সাথে দরাদরি— এসব। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে বাংলা ভাষা শিক্ষা সেই প্রয়োজন আগামী দু-তিন শ বছরেও কমবে না— সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে আমরা নিরাপদ আছি। কিন্তু ভাষা শিক্ষার আরেকটা প্রয়োজন আছে

যেটা হোলো উলম্ব প্রসার অর্থাৎ বিশেষায়িত যোগাযোগ। এই যেমন আমি এখন যে কাজটা করছি কিংবা আমি যদি আমার পেশা জীববিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করি বা শিক্ষকতা করি।

মনে রাখবেন ভাষার 'উন্নতি' বলতে আমরা যা বুঝি সেটা কিন্তু বিশেষায়িত যোগাযোগের মধ্য দিয়েই শুরু হয়। দশম শতাব্দীতে হাসান ইবন আল হাইথাম বা আলহাজেন ক্যামেরা অবস্কিউরার প্রোটোটাইপ আবিষ্কার করলেন। মানে তিনি একটা বন্ধ ঘর বা চেম্বারে শুধু ছোট্ট একটা ফুটা দিয়ে আলো ঢুকতে দিলেন। ঐ ফুটার বিপরীত দেয়ালে উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি হোলো। আরবীতে 'চেম্বার' কে 'কামারা' বলে, ঠিক যেভাবে আমরা বাসার ঘরকে বাংলায় বলি কামরা। সেই 'কামারা' ল্যাটিনদের হাত ধরে ইংরেজিতে এলো 'ক্যামেরা' হিসেবে। এখন ক্যামেরা আর কোনো বিশেষ সায়েন্টিফিক টার্মিনোলজি না; যদিও এককালে ছিলো। ঠিক তেমনি পাটনার শেখ দ্বীন মোহাম্মদ চাপানো (চাপ দেয়া) অর্থে হিন্দুস্তানী 'চাপনা'র ইমপেরাটিভ ভার্ব চাম্পু শব্দটা ব্রিটেনে ব্যবহার করলেন ১৭৯০ এর দিকে। মানে ডলাডলি দিয়ে মালিশ। সেই চাম্পু বদলাতে বদলাতে হয়ে গেলো শ্যাম্পু। এখন সবাই শব্দটা ব্যবহার করে মূল শব্দটা না জেনে।

বাংলা ভাষাতেও এ ধরনের উদাহরণের শেষ নেই। প্রশ্ন হোলো প্রথম দিকে যিনি একটি ভাষায় অন্য একটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করবেন তাকে যদি সেই ভাষাটা ব্যবহার করতেই না হয় তাহলে সেই ভাষায় নতুন এক্সপ্রেশান ঢুকবে কীভাবে? অন্যভাবে, আপনি যদি আপনার ভাষার ব্রাইট মাইন্ডসকে আপনার ভাষা ব্যবহার করাতে না পারেন তাহলে আপনার ভাষার 'উন্নতি' হবেটা কীভাবে?

তিন

বাস্তবতা হোলো জীবিকার তাড়না হোক, পেশার কারণে হোক অথবা সামাজিক চাপ— গত বিশ-তিরিশ বছরে এই জাতির সবচেয়ে মেধাবী মানুষেরা ইংরেজি শিক্ষায় যতোটা মন দিয়েছেন, বাংলায় তার কিছুই দেন নি। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা মূর্খতা, বাহাদুরী না। এই ট্রেন্ড আমার জীবদ্দশায় যে বদলাবে না সে নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য গবেষক

হতে হয় না। বরং দিনে দিনে এটা বাড়বে। লিখে রাখুন— এখন থেকে তিরিশ বছর পর বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল সাহিত্যিক বাংলাদেশে বসেই ইংরেজিতে উপন্যাস লিখবেন এবং আপনি সেই উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়বেন। বাংলা ভাষায় লেখালেখি করে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকা তো অনেক দূরের কথা— একজন ঔপন্যাসিক যে পরিমাণ খাটাখাটনি করে একটা ভালো উপন্যাস লিখবেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠকই নেই বাংলাদেশে। আয়ের কথা বিবেচনা করলে একজন ফুল টাইম ঔপন্যাসিক আসলে একজন নবীন ড্রাইভার, গার্মেন্টসকর্মী কিংবা কাজের মেয়ের চাইতে অনেক কম উপার্জন করবেন। অত্যন্ত সফল ঔপন্যাসিক হোলে তিনি হয়তো একজন ড্রাইভারের আয়ের ৬০-৭০% আয় করতে পারবেন। তিরিশ বছর পরের মেধাবী ছেলেটি মনে করবে এর চেয়ে ভালো ইংরেজিতে লেখা, কারণ সারা পৃথিবীতেই তার পাঠক আছে।

কিন্তু আমার আগ্রহ সাহিত্য না ঠিক। আমি আগেই দেখিয়েছি যে বাংলা ভাষায় বিশেষায়িত ভাব প্রকাশের সক্ষমতা সীমিত— ইংরেজির তুলনায়। এবং যেহেতু ভালো ইংরেজি শেখার পেশাগত ও সামাজিক সুবিধা মাত্রাতিরিক্ত বেশী (আপনি এমন কাওকে চেনেন যিনি খুব ভালো ইংরেজি জানেন কিন্তু খুব ভালো উপার্জন করেন না বাংলার দেশে?) সেহেতু যারা এই জাতির ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ মেধাবী ও সফল পেশাজীবী তারা সবাই উমদা বাংলা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবেন। মানতেই হচ্ছে যে বাংলাদেশে সোশাল আপওয়ার্ড মোবিলিটির একটা বড় নিয়ামক হোলো ইংরেজি।

আমরা যদি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাই অর্থাৎ বাংলার প্রসার ও উন্নতি চাই তাহলে ইংরেজি শিক্ষার কারণে যে সামাজিক ও পেশাগত সুবিধার সিঁড়ি সৃষ্টি হয় সেটাকে ভাঙ্গতে হবে— ভাঙ্গতেই হবে।

কীভাবে ভাঙা যাবে?

দুটো উপায় আছে। প্রথমটা হোলো কেউ ইংরেজি শিখতে পারবে না। আমরা সবাই শুধু বাংলা শিখবো এবং এই জাতির কেউ ইংরেজি জানবে না। আশা করি এই য়ুটোপীয়ান চিন্তার অসারতা ব্যাখ্যা করার

প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টা হোলো আমরা সবাই বাই-লিঙ্গুয়াল হবো অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে ইংরেজি শিখতে হবে।

চার

খেয়াল করুন এখন ইংরেজি শিক্ষাজনিত যে ফুটানি তার মূল কারণ হোলো অল্প কিছু মানুষ ভালো ইংরেজি জানেন এবং বাকীরা জানেন না। আমি মনে করি এই অল্প কিছু মানুষ অত্যন্ত অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন শুধুমাত্র একটা বিদেশী ভাষা জানার কারণে। যে কলোনিয়াল মেন্টালিটির সমালোচনায় রাত কাবার করি অনায়াসে তার কারণও হোলো এই অল্প কিছু মানুষের ইংরেজি জানা-জনিত সুযোগ সুবিধা। তারা একটি ভাষার সফল ব্যবহার করাটাকে এক বিশাল সক্ষমতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে– যেটা শুধু অন্যায্যই না, হাস্যকরও বটে।

এই অবস্থার পরিবর্তন হবে শুধু তখনই যখন গ্রামের ছেলেটাও চোস্ত ইংরেজিতে যোগাযোগ করবে। আশ্চর্য হবেন না, আশি বছর আগে এই বড় বঙ্গেই ঘটনাটা অহরহ ঘটতো। তখনকার গ্রামের ছেলেটা গ্রামে থেকেই ভালো ইংরেজি শিখে, মেধার জোড়ে নিজের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো। ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে।

আমার যে থিসিস তার এতোটুকু সবাই মেনে নেন একটু ভাবনা চিন্তার পরে। মানতে পারেন না এর পরের অংশটুকু।

পাঁচ

আমি আগে বিস্তারিত ভাবে প্রমিত বাংলার সমস্যার কথা লিখেছি। প্রমিত বাংলার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের ভাণ্ডার বিপজ্জনক রকমের অপ্রতুল এবং এই বাংলার একটা পিউরিটান চরিত্র আছে। এই শুদ্ধবাদী মেজাজ শুধু ভাষা না, আমাদের জীবনযাত্রাকেও ঘিরে ফেলে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক আপনি পনের বছরের একজন কিশোরী এবং কথা বলছেন আপনার বাবার সাথে এমন একটি বিষয়ে যা নিয়ে কথা বলাটা একটু লজ্জাজনক– মনে করি আপনি আপনার যোনীপথ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চান– হয়তো কোনো শারীরিক সমস্যার কথা। খেয়াল করুন

যে সামাজিক ভাবে স্বীকৃত অযৌনাত্মক কোনো সভ্য টার্মিনোলজি নেই আপনার শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের। আপনি সম্ভবত আকারে ইঙ্গিতে ভাবটা প্রকাশ করবেন। আমি বলছি না যে শুধুমাত্র প্রমিত বাংলার কারণেই এই সংকোচ তৈরি হয়েছে— ধর্ম এবং আমাদের সামাজিক রক্ষনশীলতাও এর একটি বড় কারণ— মানছি। কিন্তু প্রমিত বাংলা এই সংকোচকে ধারণ করতে সহায়তা করে।

কীভাবে করে?

প্রমিত বাংলা শুদ্ধবাদী বলে সে নতুন শব্দকে এই ভাষায় ঢুকতে বাধা দেয়। ফলে সে ভাষার যে স্টেটাস কো সেটাকে ধরে রাখে। যেমন ধরুন পনেরো বছরের এই মেয়েটি যদি আপনার সন্তান না হয়ে বাসার কাজের মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে সে সম্ভবত যোনীপথ বলতে পারবে না, এমন কি জেনিটাল বা ভ্যাজাইনা বলে যে মুখ রক্ষা করবে সে উপায়ও তার নেই। খুব সম্ভব (আমার ধারণা) তার জানা একমাত্র শব্দ এক্ষেত্রে হোলো 'ভোদা'। এই শব্দটা হোলো ভদ্রলোকদের মাথায় এয়ারপোর্টে বসানো মেটাল ডিটেক্টরে ঘন্টা বাজার মতো। কোনো মেয়ে যদি ভুলেও শব্দটা উচ্চারণে জানায়, সাথে সাথে সে ইতর মানুষে পরিণত হবে। খেয়াল করুন যে বাংলা ভাষায় জঘন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘৃণিত বা গর্হিত। শব্দটা এসেছে জঘন থেকে যার মানে হোলো মেয়েদের শরীরের তলপেটের যে অংশটুকু সামনে থেকে দেখা যায়— অর্থাৎ গ্রোয়েন। জঘন ও জঘন্যের মাঝে যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগই আপনাকে বুঝিয়ে দেয় এই ভাষার পিউরিটান চরিত্রের কথা।

আমার কাছে কোনো ডেটা নেই, এমন কি কোনো সায়েন্টিফিক রিজনিংও নেই, কিন্তু আমার ধারণা খুব ছোটো বয়সে যখন আপনার ব্রেইন হার্ডওয়্যার হওয়া শুরু করে, যেহেতু সেটা আপনার প্রথম ভাষাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সেহেতু আপনি বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পৃথিবীকে দেখতে শুরু করেন— এবং আমার হাইপোথিসিস হোলো প্রমিত বাংলার এই রক্ষণশীলতা আপনার মানসিকতাকেও রক্ষণশীল করে তোলে (আবারও বলছি— এটা আমার অনুমান মাত্র)।

প্রমিত বাংলা বা তার কাছাকাছি বাংলায় বাংলাদেশের শতকরা এক ভাগ মানুষ কথা বলেন কি না আমার সন্দেহ আছে। ফলে আমরা আসলে দুটো বাংলা শিখি জীবনে। দুটো বাংলা শেখাকে আমি কোনো সমস্যা মনে করি না কিন্তু একটি বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবকে মেনে নেয়ার তীব্র আপত্তি আছে আমার। কারণ এই গৌরবে বাকবাকুম হয়েই প্রমিত বাংলা মৌলবাদী হয়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে।

ছয়

আমি বলতে চাইছি যে বাংলা ভাষার অপ্রতুলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে বড় অন্তরায় হোলো প্রমিত বাংলা নিজে। তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি কোথায়?

আমি কোনো ভাষাবিদ নই, বাংলা ভাষার একজন সামান্য ব্যবহারকারী। আমি আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করছি মাত্র।

বাংলা ভাষাভাষীদের এমন একটা পর্যায়ে যেতে হবে যেখানে ভালো বাংলা জানা আর ভালো ইংরেজি জানা সমার্থক হয়ে উঠবে। এই ফ্লুয়িড অবস্থাটায় আপনি বাংলা না ইংরেজি ব্যবহার করবেন সেটা হবে একটা ভাষিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক গুরুত্বারোপের সিদ্ধান্ত না। কিছু লক্ষণ এখনই দেখা যাবে যদি আপনি দেখতে আগ্রহী হন। ব্লগস্ফেয়ারের বাংলায় যে পরিমাণ ইংরেজি শব্দ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে সে পরিমাণ ইংরেজি আগে কখনোই ব্যবহৃত হয় নি। যারা ব্যবহার করছেন তারা কী ভেবে ব্যবহার করছেন একটু চিন্তা করুন। তারা মনে করছেন আমার এই লেখা যারা পড়ছেন তারা যদি মোটামুটি ইংরেজি না জানেন তাহলে আমার লেখা পুরাপুরি বুঝতে পারবেন না। অর্থাৎ মোটামুটি ইংরেজি না-জানামূলক যে সম্ভাব্য সমস্যা সেটাকে লেখক পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছেন। তার দৃষ্টিতে, যে মোটেও ইংরেজি জানে না সে যদি তার লেখা নাই বা বোঝে, কোনো সমস্যা নেই।

এখন এই ধারণাটিকে খুব বড় পরিসরে পর্যালোচনা করুন।

আমি এমন একটা সময়কে কল্পনা করছি যখন প্রত্যেক লেখকই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমান করবেন যে আমার পাঠক ইংরেজি শব্দগুলো

জানে। তখন আমাদের এমন কিছু কনভেনশনে আসতে হবে যে কী ধরনের প্রত্যয় যোগ করলে একটা ইংরেজি শব্দকে অনায়াসে বাংলা বলে চালানো যাবে, সেটা সবাই জানবে। যেমন ধরুন 'গুগল করো' না বলে আমরা বলবো 'গুগলাও'। আমাদের পদবাচ্য বা সিনট্যাক্স যেহেতু ইংরেজির আদলেই গড়া সেহেতু আমি মনে করি না যে এ ধরনের কনভেনশনে গ্রহীতার পক্ষে শব্দগুলো নেয়া খুব সমস্যাকর হবে।

কিন্তু বাংলা ভাষার এই স্ট্রাকচার ধারণ করতে হোলে আমাদের কে অপ্রমিত বাংলার শরণাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ 'আবার জিগস' ঘরানার বাংলা। আমি এই বাংলাকে সম্ভাবনাময় মনে করি ঠিক এ কারণে না যে অপ্রমিত বাংলা মাত্রই দুর্দান্ত চাছাছোলা বাংলা। কিন্তু এই বাংলা অভিভাবকত্বে জর্জরিত না, যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করতে পারছেন— যে কারণে অপ্রমিত বাংলার পক্ষে সম্ভব হবে বিশাল পরিবর্তনকে ধারণ করবার। যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবে, এই স্বাধীনতার থেকেই একটা ভাষার উন্নতি— এই চেনা পথটা রুদ্ধ হয়েছে প্রমিত বাংলার অভিভাবকত্বে।

সাত

একদম শেষ কথা, বাস্তবতার কথা। আমাদের সবার আকাঙ্ক্ষা যে বাংলা ভাষা শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠবে। এই আকাঙ্ক্ষা সত্য হবে শুধুমাত্র— আরেকবার বলছি— শুধুমাত্র তখনই যখন এই দেশের সবচেয়ে মেধাবী মানুষেরা স্বচ্ছন্দে ভাষাটা ব্যবহার করবে। অদূর ভবিষ্যতে আমি এমন কোনো সম্ভাবনা দেখি না যে এ দেশের সফল ও মেধাবী মানুষগুলোর পার্থিব উন্নতির জন্য বাংলা ভাষা জানাটা একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে ভালো ইংরেজি জানা আর ভালো বাংলা জানা বেশ কাছাকাছি পর্যায়ের সক্ষমতা সেক্ষত্রে আমরা আশা করতে পারি যে বাইলিঙ্গুয়াল হওয়ার সুবিধাটা তারা প্রয়োগ করবে।

২০১৪

ইংরেজিতে বিজ্ঞানচর্চা - যে কারণে দরকার

সম্প্রতি বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর-এ একটি লেখায় ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী মত দিয়েছেন যে সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের টেক্সট লেখা হোলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার বেশী ঘটবে বলে সেটা কাম্য। আমি লেখকের সাথে একমত নই। তানভীরুল ইসলাম লিখেছেন যে বিজ্ঞান চর্চা কেন মাতৃভাষায় করা আবশ্যক। লিখেছেন, মাতৃভাষায় একজন শিক্ষার্থী যেভাবে বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেভাবে অন্য ভাষায় পারবে না। আমি লেখকের সাথে একমত নই। ফিরোজ আহমেদ লিখেছেন যে *"সুবিধাজনক অবস্থার কল্যাণে প্রাপ্ত ইংরেজিজ্ঞানকে জ্ঞানার্জনের উপায় এবং মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা গেলে তাই তার (মধ্যচিত্তের বাঙালি, মানে আমি) চেয়ে সন্তুষ্ট কেউ থাকে না"*। এবং এটি মধ্যচিত্তের বাঙালির হিপোক্রিসি। আমি বুঝতে পারছি না মধ্যচিত্তের বাঙালি সম্বন্ধে লেখকের এই অভিযোগ যদি সত্যও হয়ে থাকে সেটা হিপোক্রিসি হিসেবে কীভাবে কোয়ালিফাই করে?

আমি নিজে ইংরেজি শিখে জ্ঞানের জগতে নিজের বিচরণ সুগম করে অপরকে যদি অন্য একটি ভাষায় আটকে থাকার পরামর্শ দেই, সেটাকে বরং বলা যেতে পারে হিপোক্রিসি। আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী যেমনটি করেন। দেখি, যে তারা বাংলায় শিক্ষা প্রসার নিয়ে গলা ও কলম ফাটিয়ে অন্যদের হিতোপদেশ দেন কিন্তু নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান। আমি যে সুযোগ পেয়েছি, সে সুযোগ অন্য সবার পাওয়া উচিত এবং আরো কম বয়স থেকে পাওয়া উচিত, এই মত প্রকাশ করা আর যাই হোক, হিপোক্রিসি হতে পারে না। রাগের মাথায় শব্দটি ব্যবহার না করে থাকলে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগে লেখকের আরো

সতর্কতা প্রয়োজন, যেটা বেশী করে ইংরেজি চর্চা করলে আয়ত্তে আসবে বলে আমার অনুমান। বলাই বাহুল্য, আমি এই লেখকের সাথেও একমত নই। স্বভাবতই উপরোক্ত তিন লেখকের প্রতিটি বক্তব্যের সাথে আমি ভিন্নমত পোষণ করি না, করি মূল সুরের সাথে এবং আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমাদের জন্য ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এবং সম্ভব হোলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার করা জরুরী। পাঠক, দয়া করে ভাববেন না যে ইংরেজির বিপরীতে বাংলাকে দাঁড় করিয়ে কোনো ভাষার মহত্ত্ব কিংবা দীনতা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য। ভাষাকে আমি এই লেখায় কেবলমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছি।

প্রথমে আমি দুজন বিজ্ঞানীর মতামত উল্লেখ করবো যাদের প্রথম ভাষা ইংরেজি না। দেখা যাক তারা কীভাবে, কোন ভাষায় বিজ্ঞান চিন্তা করেন। প্রথম জন বিশ্বখ্যাত, ১৯৯৬ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইমিউনোলজিস্ট রলফ জিঙ্কারনেগেল (তার বিদ্যাশিক্ষা এবং খুব সম্ভবত প্রথম ভাষা /মাতৃভাষাও জার্মান)। অন্য একটি লেখায় আমি উল্লেখ করেছি যে রালফ স্টাইনম্যান ও রলফ জিঙ্কারনেগেলের মতো ভালো সায়েন্টিফিক ইংলিশ অন্তত আমি কাউকে লিখতে দেখি নি। তাকে আমি সরাসরি তিনটি লিখিত প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্ন ও উত্তরগুলো যেন অনুবাদের ফাঁকে একটুও হারিয়ে না যায় সেজন্য মূল ইংরেজিতেই দেয়া হোলো।

Do you think in English when you write about science or you just translate your thoughts (which are processed in your first language)?

— No, I think in English.

Do you think it is any longer possible to be and thrive in science in a language other than English?

— Yes, of course, English is just more convenient.

Would you recommend anyone whose first language is not English to think in English to survive in Science?

— Clear thinking is sufficient plus some help in writing properly in English.

দ্বিতীয়জন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, ডঃ আবেদ চৌধুরী। নাম করা জেনেটিসিস্ট (বিশ্বখ্যাত জার্নাল Nature-এ তার পাবলিকেশান আছে) এবং বাংলাদেশে লেখক হিসেবেও পরিচিত। তাকে আমি কেবল প্রথম প্রশ্নটি করেছিলাম যে তিনি কোন ভাষায় বিজ্ঞান চিন্তা করেন। তিনি বললেন যে অবশ্যই ইংরেজিতে যদিও তিনি বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যে ভণ্ডামির অভিযোগটি একটু আগে আমি উল্লেখ করলাম সেটা তিনিও করলেন এবং যোগ করলেন, 'cognition এর কী বাংলা তুমি করবা'?

একটু খেয়াল করুন যে জিঙ্কারনেগেল যিনি একজন নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী এবং যার নিজের ভাষা বিজ্ঞান চর্চার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক তিন-চারটে ভাষার একটি, তিনিও বিজ্ঞান-চিন্তা করেন ইংরেজিতে। তিনি মনে করেন যে অন্য ভাষায় এখনও বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব, তবে ইংরেজিতে সুবিধাজনক। এখানে কিন্তু একটি ভাষার সাথে আরেকটি ভাষার তুলনা আসতে বাধ্য। অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চায় ইংরেজির তুলনায় বাংলা যতোটা সুবিধাজনক, জার্মান ভাষা তার চেয়ে অবশ্যই বেশী সুবিধাজনক যেহেতু জার্মান ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য যথেষ্ট উজ্জ্বল। বর্তমান লেখায় এ নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। এবং তৃতীয়ত তিনি বিজ্ঞান চর্চার জন্য স্পষ্ট চিন্তা এবং শুদ্ধভাবে ইংরেজি লিখতে পারাটাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। 'Clear Thinking' কিন্তু কোনো জন্মগত বৈশিষ্ট্য না, এটা অনুশীলন ও একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত হয়। আমার দাবী শুধুমাত্র এতোটুকু যে এই প্রক্রিয়া ও অনুশীলনে একটি ভাষার যে রসদ থাকা অপরিহার্য সেটি আমাদের না থাকায় ইংরেজিতে বিজ্ঞান চর্চা করা সুবিধাজনক।

যারা বলেন যে জার্মান, জাপানিজ ও চাইনিজরা নিজেদের ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে পারলে আমরা কেন পারবো না, ক্ষমা করবেন, তাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে বলে মনে করি। উসাইন বোল্ট ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ুতে পারলে আমি কেন পারবো না, আমার কি দুটা পা নাই, আমি কি দৌড়াতে পারি না? এই প্রত্যয় শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু আমি বললে আপনারা যে আমাকে পাগল বলে গালি দেবেন সেটা আমি শুনতেই পারছি একরকম। বিজ্ঞান চর্চার রেসে জার্মান, জাপানিজ ও

চাইনিজরা হয়তো ইংরেজির চেয়ে পিছিয়ে ছিলো সবসময় এবং আছেও; কিন্তু তারা তো রেসটা ছেড়ে দেয় নি কোনোদিন। আমরা তো এই রেসে নামিই নি কোনোদিন। আমাদের সাথে কি ওদের তুলনা চলে? আপনি যদি ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ে তিন বছর বিরতি দিয়ে আবার পড়া শুরু করেন তাহলে জ্ঞানের অভাবটা হয়তো পুষিয়ে নিতে পারবেন, যদি আট বছর বিরতি দিয়ে ক্লাস টেনে ভর্তি হয়ে যান তাহলেও হয়তো কেউ কেউ ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবেন; কিন্তু ক্লাস টু থেকে সরাসরি অনার্সে ভর্তি হোলে জ্ঞানের যে ঘাটতি হয়েছিলো— সেটা কি পোষানো যাবে? গত একশ বছরে বিজ্ঞানের যে প্রসার হয়েছে তার আগের হাজার হাজার বছরে সে তুলনায় হয়তো ভগ্নাংশ পরিমাণও হয় নি (এখানে আমি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুরুত্বের কথা বলছি না, বলছি সাধারণ মানুষের মাঝে এর প্রসারের কথা। মনে রাখবেন নিউটন যখন ক্যালকুলাস আবিষ্কার করছিলেন, তখন ব্রিটিশ নেভাল ফোর্সের প্রধান, সাধারণ ভাগ অংক শিখছিলেন)। এই একশ বছরে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় প্রসারের ফলে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজির সাথে বাংলার যে দূরত্ব সৃষ্টি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে সেটা মেটানো এক কথায় অসম্ভব এবং এই বাস্তবতা অস্বীকার করার মধ্যে বাহাদুরি নেই, আছে মূর্খতা।

এক্ষেত্রে আরও একটি অবান্তর উদাহরণ হোলো শিল্প-বিপ্লবোত্তর আধুনিক যুগে ইংরেজির উত্থানের কথা টেনে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে, তখন তারা পারলে এখন আমরা পারবো না কেন? পারবো না এই জন্য যে First Mover Advantage একজনই নিতে পারে, সবাই না। ebay যখন '৯০ এর দশকে ব্যবসা শুরু করে অকল্পনীয় রকমের সাফল্য অর্জন করে তখন অনেকেই ভেবেছিলো যে, ওরা পারলে আমরা পারবো না কেন? এবং তারা সবাইই ফেইল করেছিলো কেননা ebay তে কেনাকাটা করলে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে Feedback পায় সেটা তো আরেকটা ওয়েব সাইটে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কার এতো সময় আছে আবার নতুন করে ঝামেলা শুরু করার। ইংরেজির আগে পৃথিবীতে যে Lingua Franca গুলো ছিলো সেগুলো প্রযুক্তির সুফল পায় নি। তখন সাধারণ মানুষ জ্ঞান চর্চা করতো না যেটা এখন করে। প্রযুক্তির কল্যাণে একটা শিশু ঘরে বসে টিভি দেখে, কোনো শিক্ষক ছাড়া বিদেশী একটা

ভাষা শেখে, যা একশ বছর আগে মানুষ কল্পনাও করে নি। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ব্রাইট মাইন্ড নিজের ভাষায় না লিখে ইংরেজিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো লিখছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলোরই Language of Instruction হোলো ইংরেজি। এমন মনে করা কি বাস্তবসঙ্গত যে এরা নতুন করে আরেকটি ভাষা শিখে সবাই সে ভাষায় জ্ঞান চর্চা শুরু করবে কিংবা আমরা এতো জোড়ে দৌড়ানো শুরু করবো যে ওদের ধরে ফেলবো?

ফিরোজ আহমেদসহ অনেকে মনে করেন যে বিজ্ঞানের সব টেক্সটকে বাংলায় অনুবাদ করলেই সব কেল্লাফতে হয়ে যাবে। আবার অনেকের ধারণা: পরিভাষা সে আর এমন কি, অনুবাদ করে দিলেই হোলো (পাঠক বুঝলো কি না সেটা পাঠকের সমস্যা, বড়জোর অনুবাদকের সমস্যা, কিন্তু কোনোমতেই ভাষার সমস্যা না)। সম্ভবত তাদের বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের টেক্সট আর জেফরি আর্চারের থ্রিলার অনুবাদ করা এক জিনিস। বাংলা একাডেমী ধরনের বিশাল একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে যার কাজ হবে বিজ্ঞানের অনুবাদ করা। সংকল্পটি মহৎ, সন্দেহ নাই কিন্তু ভুলতে পারি না যে– *The road to hell is paved with good intentions.*

ক্রিকেটে 'দুসরা' কোন ধরনের বোলিং এটা কোনো ক্রিকেট-প্রেমীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না, তা তিনি যে ভাষারই লোক হোন না কেন। তা বোলিংটা 'other one' না হয়ে 'দুসরা' হোলো কেন? কেননা এটা আবিষ্কার করেছেন সাকলায়েন মুশতাক এবং তিনি যেহেতু উর্দুতে দুসরা বলেছেন– সেহেতু অস্ট্রেলিয়ানরাও এই বোলিংকে দুসরাই বলে, অন্য কোনো শব্দ দিয়ে নির্দিষ্ট করার কসরত করে না।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এমনই একটা অর্গানিক ডেভেলাপমেন্ট, এটা ওহী মারফৎ নাযিল হয় না। প্রত্যেকটি পরিভাষার একটা পরম্পরা আছে। এই পরম্পরাটি কিন্তু এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল যেটার কোনো অনুবাদ হয় না অন্য কোনো ভাষায়। ঐ যে রেসের কথা বলছিলাম, সেই রেসে থাকলেই কেবল ঐতিহ্যটার সাথে পরিচিত থাকা যায়। পরম্পরাটি আমাদের নেই বলে আজগুবি শব্দ দিয়ে একেকটা জিনিসকে নির্দিষ্ট করতে হবে যেটা হয়তো কোনো সেন্স-মেইক করবে না। DNA কে জীয়ন-সূত্র বা জীবন-লতিকা বলে কবিতায় উতরে যাওয়া হয়তো যাবে, কিন্তু একজন বিজ্ঞানী

এমন উদ্ভট অনুবাদ গ্রহণ করবেন কেন? মোবাইল ফোনকে আজকাল মুঠোফোন লেখার রেওয়াজ শুরু হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় (এখনও কাউকে বলতে শুনি নি)। তা আমরা যে ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করি সেটা কি মুঠোতে না রেখে বগলে রাখি? আর ল্যান্ড ফোন তাহলে বাংলায় কী হবে? তার-ফোন, দূরালাপনী না অন্যকিছু? যেখানে বিজ্ঞানের অতি সাধারণ ধারণাকে সুনির্দিষ্ট করার বাংলা শব্দ আমরা খুঁজে পাই না, সেখানে জটিল বিষয়গুলোর অনুবাদ হবে কীভাবে? ফিরোজ আহমেদ সম্ভবত ভাবেন যে বিজ্ঞান 'লিখার' জিনিস এবং 'লিখার' অবকাঠামো থাকলে 'অতি উচ্চ স্তরের টেক্সট' সব ক্ষণে ক্ষণে মুসাবিদা হয়ে যাবে বাংলা ভাষায় (আমি দেখেছি যে সরকারী কর্মকর্তাদের এ ধরনের উচ্চাশা থাকে, তারা অবকাঠামো থাকলে মুরগী দিয়ে হালচাষ করার প্রকল্পও বাস্তবায়িত করে দেয়ার আশ্বাস দেয়)। সেক্ষেত্রে তার তো অনুবাদের একটা দায় আছে, নাকি? বেশী না মাত্র কয়েক' শ শব্দের সাধারণ একটা পিএইচডি থিসিসের Abstract এই লেখার পরিশিষ্টে যোগ করা হোলো। যিনি বিজ্ঞানের 'সব টেক্সট' বাংলায় অনুবাদ করে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি সামান্য একটা Abstract অনুবাদ করতে নিশ্চয়ই পারবেন আর পাঠকরাও এতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে যারপরনাই উৎসাহিত হবেন (পরিভাষাটুকু ইংরেজিতেই রাখুন, অসুবিধা নাই)।

তানভীরুল ইসলামসহ অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে মাতৃভাষায় একটি ধারণাকে যেভাবে অন্তরস্থ করা যায় সেটা অন্য কোনো ভাষায় সম্ভব না। এই তত্ত্বের কোনো প্রমাণ আমি চারপাশে দেখি না এবং আমি এর ঘোরতর বিরোধী। প্রথমত, আমি মাতৃভাষা না বলে প্রথম ভাষা বলবো কেননা মাতৃভাষা বললে এমন একটা আবেগ তৈরি হয় যার বশবর্তী হোলে অন্য ভাষার চর্চা 'মায়ের' ভাষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কাছাকাছি চলে আসে। এই অবস্থা বাস্তবানুগ না দেখে শব্দটি আমি পরিহার করতে চাই। পাঠকরা বিরক্ত না হোলে একটু নিজের কথা বলি। আমি অল্প-বিস্তর পড়ালেখা জানা মানুষ এবং এতোটুকু দাবী করা সম্ভবত অন্যায় হবে না যে বাংলা ভাষায় আমার বোঝার, লেখার ও বলার ক্ষমতা গড়পড়তা বাংলাদেশীদের চেয়ে খুব কম হবে না। সে তুলনায় আমার ইংরেজি জ্ঞান সীমিত। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি ইংরেজি ছাড়া সব

বিষয় পড়েছি বাংলায়। কিন্তু আমি বিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করি ইংরেজিতে, বাংলায় না; তার কারণ একটাই: আমার কাছে ইংরেজিতে বুঝতে সহজ মনে হয়। বাংলায় পড়লে আমি মনের মধ্যে ছবিটা আঁকতে পারি না।

এই অভিজ্ঞতা আমার একার না। এই দেশেরই ইংলিশ মিডিয়ামের হাজার হাজার ছাত্র সব বিষয় ইংরেজিতে শেখে, তারা তো বাড়ীতে বাংলাতেই কথা বলে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শুধুমাত্র জাতীয় ফলাফলের ভিত্তিতে) ক্যাডেট কলেজগুলোর শিক্ষা মাধ্যম এখন ইংরেজি হয়ে গেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের কাছে তো আমি শুনি যে তাদের প্রথম ভাষা বাংলাই অনেক কঠিন, ইংরেজিতেই বরং বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক সহজ। আমার বহু সহকর্মী ভারতীয়। এদের দুজনই কেবল হিন্দি মিডিয়ামে পড়ালেখা করেছে আর ঐ দুজনই বলে যে হিন্দি মিডিয়ামে পড়াশোনা করে বিজ্ঞান চর্চা তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। আমরা না হয় ভারতীয় উপমহাদেশের সব ঔপনিবেশিক মানসিকতা আক্রান্ত মানুষ, চাইনিজ সহকর্মীদের অনুযোগ যে আরো ভয়াবহ। সরকারী প্রকল্পে বিজ্ঞান অনুবাদ যে কী বিচিত্র জিনিস চাইনিজদের জিজ্ঞেস করলে বুঝবেন। DNA, PCR এমন কি বাংলাদেশ নামটিরও (শুনেছি ম্যান্ডারিনে বাংলাদেশের নাম মনজালা, এটি সম্ভবত আগের থেকেই ছিলো) অনুবাদ করতে গিয়ে তারা এমন এক চোঙ্গা দিয়ে পৃথিবী দেখা শুরু করে যে তার থেকে আর নিস্তার পায় না, পিএইচডি করতে এসে পস্তায় প্রতি মুহূর্তে আর বলে তোমরা বাংলাদেশী আর ইন্ডিয়ানরা কী ভাগ্যবান, বিজ্ঞান পড়েছো ইংরেজিতে। এই ভুল বুঝতে পেরে কি না জানি না, তারা এখন পূর্ণোদ্যমে ইংরেজি শিখছে নিজ দেশে এবং ২০৪০ এর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইংলিশ স্পীকিং কান্ট্রি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে চায়না! দেশের বাইরে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী শিশু কিশোর অন্য ভাষায় লেখাপড়া করছে কিন্তু তাদের প্রথম ভাষা বাংলা। এতে কি এদের বিজ্ঞান শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে? মধ্য যুগের এমন স্কলার কমই পাওয়া যাবে যারা Bilingual কিংবা Multilingual ছিলেন না। তাতে কি তাদের বিদ্যাচর্চা থমকে গিয়েছিলো?

বিদ্যার্জন অনুশীলনের ব্যাপার। যে ভাষায় আপনি অনুশীলন করবেন, সে ভাষাতেই আপনি ভালো করে বুঝতে শুরু করবেন— ধীরে ধীরে। প্রশ্ন

হোলো যে ভাষায় আপনি অনুশীলন করছেন সে ভাষার এমন সক্ষমতা আছে কি না যে সে ধারণ করবে প্রয়োজনীয় কনসেপ্টগুলো— ভাষাটি আপনার প্রথম না দ্বিতীয় সেটা খুব বড় বিষয় না। খুব ভালো হতো যদি বাংলা ভাষার এই সক্ষমতা থাকতো, কিন্তু বাস্তবতা হোলো সে ক্ষমতা আমাদের নেই। বাংলা ভাষায় অনুশীলন করলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন (সে রসদ আমাদের আছে)। এতোটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য যথেষ্ট কিন্তু এরপর থেকে আপনাকে ইংরেজিতেই বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে যদি আপনার পেশায় বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্টতা থাকে। এটাই যদি অনতিক্রম্য বাস্তবতা হয় তাহলে যে ছোটোবেলা থেকে ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখবে সে তো বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষাকারীর চেয়ে পরবর্তীতে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে। এই সুবিধাটি আমি অন্যায্য মনে করি কেননা কেবল অর্থ থাকলে আপনার সন্তান এ সুবিধাটি পায়। গ্রামের ছেলেটা মেধাবী হয়েও এ সুযোগটা পায় না। এই আনফেয়ার এডভান্টেজটা যেন না থাকে সেই প্রচেষ্টা একজনের কাছে হিপোক্রিসি ঠেকেছে, জাদরেল বাঙালি বটে!

আরেকটা মজার তত্ত্ব আছে। ইংরেজি আমাদের 'শিখতেই' হবে কেননা ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা (এই কথাটা না বললে জাতে থাকা যায় না) আবার পড়াশোনার মাধ্যম বাংলা হতেই হবে (এই কথাটা না বললে পলিটিকালি কারেক্ট হওয়া যায় না)। এই দুয়ের মিশ্রণ যে কী বিচিত্র জিনিস গত চল্লিশ বছরে আমরা ভালোই দেখেছি। বাংলাদেশে আমার এক ছাত্র য়ুনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে participate শব্দটার অর্থ জানতো না। সিডনীতে মোট এগারজন বাংলা মিডিয়ামে পড়া স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো National Anthem মানে কী, নয় জন উত্তর দিতে পারে নি (এর মধ্যে একজন নটরডেমিয়ানও আছেন)। এ প্রসঙ্গে একজন লেখকের মনোহর স্ববিরোধিতা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

যে পাঠক তার গবেষণা বাংলায় লেখার প্রত্যয় জানান, তাকে তিনি বাহবা দেন, উপদেশ দেন বেশী বেশী ইংরেজি জেনে অন্যের জন্য জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে। কিন্তু গোটা জাতিকে Bilingual করার প্রচেষ্টা তার কাছে মনে হয় অসম্ভব। অর্থাৎ আমি-তুমি যারা ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়ি

তাদের ইংরেজি জানাটা জরুরী কিন্তু গ্রামের লোকজনদের ইংরেজি না জানলেও চলবে, তাদের জন্য আমরা দেবো আজগুবি অনুবাদের বিজ্ঞান বই। এবং এটাই নাকি জ্ঞানের ইতরীকরণ! আমার আপনার মতো কিছু মানুষ ইংরেজি শিখে কর্মক্ষেত্রে তার সুবিধা না নিয়ে, য়ুনিভার্সিটির টিচিং ও রিসার্চ পজিশন ছেড়ে দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সব অনুবাদ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন ভাবনা শিশুতোষ চিন্তার জাদুঘরের একদম প্রথম কক্ষটায় স্থান পাওয়ার যোগ্য। আরো আছে! আমি-আপনি ইংরেজিসহ অন্য ভাষা শিখবো এবং শিখে Bilingual ও Multilingual হবো কিন্তু গোটা জাতির Bilingual হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার, তাই আমরা সে চেষ্টা করবো না। কিন্তু সমস্যা হোলো কে ইংরেজি শিখবে আর কে শিখবে না— এটা ঠিক করে দেবে কে? হাজার হাজার বই বাংলায় অনুবাদের চেয়ে একজন ছাত্রকে ইংরেজি শিখিয়ে দিলে যে তার পৃথিবীটা এমনিতেই অনেক বড় হয়ে যাবে এটা বোঝা নিশ্চয়ই রকেট সায়েন্স না।

আরো আছে! লেখকের মতে মধ্যচিত্ত প্রতিষ্ঠার নিরাপদ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে চায় (এই কথাটা পুরোপুরি সত্য বলে মনে করি)। আবার পরক্ষণে এও বলেন যে মধ্যচিত্তের প্রস্তাবিত সকলকে ইংরেজি শেখানোর পথ খুব দুরূহ, তার চেয়ে অনেক সহজ 'সব' টেক্সট বাংলায় লিখে ফেলা (এটি যিনি বলছেন তাকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন যে জীবনে তিনি দুই ছত্র বিজ্ঞান অনুবাদ করেছেন কি না?)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যচিত্তের প্রস্তাবনাটিই আসলে বেশী কঠিন এবং মধ্যচিত্ত চাইছে গ্রামের একটি ছেলেও যেন তার কাতারে চলে আসে, যেন একটি বিদেশী ভাষা জানার সুবিধা সে নিজে একা ভোগ না করে। কিন্তু তারপরেও তিনি মধ্যচিত্ত এবং হিপোক্রিসি আক্রান্ত, কী বিচিত্র এই বিচার!

একটা জুজুর ভয় আমাদের মধ্যে খুব কাজ করে যে ইংরেজিতে বিদ্যাশিক্ষা করলে আমরা যেন আর কেউ বাঙালি থাকবো না, সব মগজের দাস হয়ে যাবো। ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া কোন প্রভাবশালী নেতাটি চোস্ত ইংরেজি না জেনে নেতা হয়েছিলেন, বলুন দেখি? বাংলা সাহিত্যের কোন দিকপাল ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী নন? সত্যেন বসু কিংবা জগদীশ চন্দ্র বসু কোন ভাষায় বিজ্ঞান শিখেছিলেন? এরা কি সব মগজের দাস হয়েছিলেন?

আমাদের সন্তানরা ইংরেজি শিখলে তাহলে কেন সব বিজাতীয় হয়ে যাবে বলে আমাদের ভয়? একশ বছর ধরে ইংরেজি শিক্ষা চালু রেখে ভারতীয়রা কি সব সংস্কৃতিহারা হয়ে গেছে, না একেনমিক পাওয়ার হাউজে পরিণত হয়েছে? ইংরেজি শিক্ষা-জনিত যে উন্নাসিকতা এবং আরেক পক্ষের হীনম্মন্যতা আমাদের চোখে পড়ে তার কারণ মাত্র কিছু লোক এই সুবিধাটা পায় এবং আমি এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধে। বরং আমি মনে করি, সার্বজনীন ইংরেজির চর্চা হোলে আমাদের সন্তানেরা এমনভাবে তাদের দেশকে চিনতে শিখবে যার উদ্বোধন হয়তো আমাদের হয় নি। হ্যা, তারা হয়তো বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে দেখতে শিখবে কিন্তু সেটা খুব খারাপ হবে বলে আমরা ভয় পাচ্ছি কেন? তাছাড়া আমরা যেভাবে দেশটাকে চিনেছি তাতে হানাহানি-কাটাকাটি কমেছে বলে তো মনে হয় না। তাদের বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে ভালোও তো হতে পারে।

শেষ করতে চাই একটি বাস্তবতার কথা বলে। আপনি যতোই ঔচিত্যমূলক আদর্শবাদে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভাষার জয়গান করুন না কেন, বাস্তবতা হোলো, ভালো ইংরেজি যে জানবে সে এমন সব সম্ভাবনার মুখোমুখি হবে যা অন্য কোনো ভাষা জেনে সম্ভব না। প্রবাসে দেখেছি অসংখ্য মেধাবী বাংলাদেশী শুধুমাত্র ইংরেজির দখল না থাকার জন্য ভারতীয়দের থেকে পিছিয়ে পড়ে। খারাপ খবর হোলো আমার জীবদ্দশায় এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না। আর ভালো খবর হোলো আপনিও ভালো ইংরেজি শিখে অন্য অনেক দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারবেন, নিজ দেশে ও প্রবাসে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ খবর হোলো আমাদের দেশেরই কিছু মানুষ বিচিত্র ধরনের দিবাস্বপ্নের কথা বলে আপনাকে পলিটিকালি কারেক্ট বানানোর চেষ্টা করবে যেগুলো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে বিরক্তি ছাড়া অন্য কিছুর উদ্রেক করে না। যে টেক্সটের পাঠক গোটা দেশে পাঁচশ জন নেই এবং ক্রেতা নেই দশ জন (বাকীরা সব বইটা ফোটোকপি করবে) সেই টেক্সট বাংলায় অনুবাদ করতে খরচ করবো লক্ষ লক্ষ টাকা এবং মূল প্রকাশককে দিতে হবে লক্ষ ডলার রয়ালটি বাবদ; এবং অনূদিত বইটি কী বস্তু হবে সেটাও আমাদের জানা নেই। তাছাড়া কে করবে এই অনুবাদ? চল্লিশ বছর ধরে বাংলায় বিজ্ঞান

শিক্ষা বলবৎ রেখে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সহজবোধ্য বাংলায় বিজ্ঞান বই লিখতে পারি না, যে অভিযোগ ফারসীম মোহাম্মদী যথার্থই করেছেন। এখন পর্যন্ত যে দেশে হাজার বছরের 'মাতৃভাষা' বাংলার চূড়ান্ত কোনো ব্যাকরণ বই লেখা যায় নি সে দেশে স্বপ্ন দেখবো যে বৈজ্ঞানিক টেক্সটের অনুবাদ হবে কাতারে কাতারে।

বারো বছর আলাদা একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার পলিসির যে মনুমেন্টাল ফেইলিয়র হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সফল, বিত্তবান ও যারা এই পলিসি ফেইলিয়রের জনক, তারা কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান, তারা বোঝেন সব ফাঁক-ফোঁকর আর তাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের তারা পড়ান ইংলিশ মিডিয়ামে এবং য়ার টুয়েলভের পরেই পার্সেল করে পাঠিয়ে দেন বিদেশে। আর সাধারণদের জন্য আছে মাতৃভাষা আর দেশপ্রেমের সবক। ভুল বুঝবেন না, তারাই ঠিক কাজটা করেন এবং আমার অনুরোধ আপনারাও একই কাজ করুন, আপনার জন্য সময় থেমে থাকবে না। ভালো ইংরেজি শিখুন, অবশ্যই ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখার চেষ্টা করুন এবং ইংরেজিতে ভাবনার অনুশীলন করুন, আপনার বাংলা ভালো হবে।

পরিশিষ্টঃ এই অংশটুকু তাদের জন্য, যারা সায়েন্টিফিক ইংলিশ জিনিসটা কী তার অতি সামান্য ধারণা পেতে চান। পরিভাষা ছাড়া বিজ্ঞান হয় না, তবুও পরিভাষার অনুবাদের কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকুন, পরীক্ষা করুন যে ক্রিয়াপদ, বিশেষণ আর বিশেষ্যগুলো বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব কি না? আর মনে রাখবেন, Abstract কিন্তু লেখা হয় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠকদের জন্য, যে সমস্ত বিজ্ঞান বইয়ের অনুবাদের কথা হয়েছে সেগুলো এর চেয়ে বহুগুণ জটিল।

Abstract

The cytokines interleukin-3 (IL-3), interleukin-5 (IL-5), and granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) exhibit overlapping activities in the regulation of hematopoietic cells. All these cytokines signal via a specific alpha receptor (α) and the shared human beta common

subunit (hβc). This thesis explores IL-3 and GM-CSF receptor binding and activation mechanisms.

GM CSF is an important mediator of inducible hematopoiesis and inflammation with a critical role in the function of alveolar macrophages. GM CSF signals via GM CSFRα and hβc. This thesis investigated the role of the Ig-like domain of the GM CSFRα in GM CSF binding and signalling. Deletion of the Ig-like domain abolished direct GM CSF binding and decreased growth signalling in the presence of hβc. Val51 and Cys60 were found having critical roles in binding to the α receptor with Arg54 and Leu55 also important. High affinity binding in the presence of hβc was strongly affected by mutation of Cys60 and also reduced by mutation of Val51, Arg54 and Leu55. Growth signalling was most severely affected by mutation of Cys60. The results indicated a previously unrecognized role for the Ig-like domain, and in particular Cys60, of GM CSFRα in the binding of GM CSF and subsequent activation of cellular signalling.

২০১১

বাংলা নিউমেরাল প্রসঙ্গে

আলাপ

ছোটোবেলায় অংকে ভালো ছিলাম না। কী যেন একটা ভয় কাজ করতো। অংক বিষয়টাকে খুবই নাজুক কিছু মনে করতাম— অর্থাৎ উত্তর মিলবে অংকের জানি; কিন্তু শুধু এভাবে অংক করলেই মিলবে। এই অর্থে নাজুক যে উত্তর মিলাতে হোলে কেবল একটাই সরল পথ আছে এবং আমাকে ঐ রাস্তাতেই উঠতে হবে। অংকের সমস্যা সমাধানে আমি কোনো মজা পেতাম না। সমসময় খুঁজতে থাকতাম কোন সেই রাস্তা— যে রাস্তায় উঠে গেলে উত্তরটা মিলে যাবে। যতো বেশী প্র্যাকটিস করবো ততো তাড়াতাড়ি ঐ রাস্তাটায় ওঠা যাবে।

পেছনে ফিরে তাকালে যে ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলে সেটা হোলো এই সমস্যা আমার একার ছিলো না। এখন আমার মনে হয় যে আমাদের ক্লাসে তিন-চার জন ছাড়া কেউই গণিতের যে ইনহেরেন্ট লজিক— সেটা বুঝতো না। তবে অনেকেই অংকে ১০০ পেতো— তার কারণ তারা একনিষ্ঠ ছিলো বলে ঐ যে অংকের রাস্তা বললাম— সেই রাস্তাটায় দ্রুত উঠে পড়তে জানতো। তার মানে এই না যে তারা অংকে 'ভালো' ছিলো। ভারে কাটতো, ধারে না।

পরে বিদেশে পড়তে এসে দেখলাম চায়না, ভিয়েতনাম, রাশা— এরকম কয়েকটা দেশের ছেলেমেয়েরা অন্য অনেক বিষয়ে লবডঙ্কা হোলেও অংকে অসম্ভব ভালো। বাংলাদেশে থাকতে আমার উচ্চাশা জন্মেছিলো যে আমি অংকে মোটামুটি, লেগে থাকলে পারবো; অস্ট্রেলিয়ায় এসে আবিষ্কার করলাম— আমি আসলে যাচ্ছেতাই, ভিতে জোর নাই।

তো আমরা সবাই একযোগে অংকে এতো খারাপ হয়েছিলাম কীভাবে?

সমস্যা

প্রথম কারণ হতে পারে শিক্ষকতার মান। বাংলাদেশের শিক্ষকতার গড় মান খুবই খারাপ— কিন্তু বিশ-পঁচিশ বছর আগে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকরা আমি নিজে পড়াশোনায় যতোটা হোপলেস— ততো খারাপ ছিলেন না। অনেকেই বেশ ভালো শিক্ষক ছিলেন— কিন্তু আমাদের ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে তিন-চারজন ছাড়া বাকীরা অংকে ভালো ছিলো না। সব ব্যাচেই ঠিক একই অবস্থা ছিলো।

কর্মজীবনে ঢোকার পর দেখলাম বাংলাদেশে সবজায়গায়— মানে 'প্রত্যেকটি' কর্মস্থলে দুয়েকজন ছাড়া সবাইই গণিত ভয় পায়। ৯৯টা মানুষ গণিতের সাথে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক দেখতে পায় না— তাদের চোখে পরীক্ষায় পাশ করতে হোলে অংক করতে হবে— ব্যস এতোটুকুই।

কেন এমন হোলো?

একটা গল্প বলি। আমার মেয়ের বয়স তখন সাড়ে তিন। ভাঙা ভাঙা কথা বলতে পারে। তোতা পাখির মতো ওয়ান-টু-টেনও বলা শুরু করেছে। এই নাম্বারগুলো কী সিগনিফাই করে তা সে বুঝতো না— শুধু মনে হয় বুঝতো যে সংখ্যার ক্রমটা ঠিক রেখে ওয়ান-টু-টেন বলতে পারলে বাবা তালি দিবে, কোলে নিবে (রিওয়ার্ড মেকানিজম)। মেয়েটা আমার কোলে— একদিন কোনো এক এপার্টমেন্টে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম আর দরজায় ঝোলানো নাম্বারগুলো দেখিয়ে জোড়ে জোড়ে বলছিলাম। বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম— আমরা যখন সাতাশ নম্বর এপার্টমেন্টে উপস্থিত হলাম, মেয়েটা স্পষ্ট বললো, টোয়েন্টি সেভেন।

লক্ষ্য করুন যে সে সংখ্যা কী বোঝে না, শুধু ওয়ান-টু-টেন বলতে পারে আর লেখা নাম্বারগুলোর সাথে মুখের উচ্চারণ জোড়া লাগাতে পারে। আমি যখন ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা নাম্বার উচ্চারণ করছিলাম, সে নাম্বার কী মোটেও না বুঝে নাম্বার প্রোগ্রেশানের যে লজিক সেটা ধরে

ফেলেছে। সে টোয়েন্টি সেভেন কী জানে না কিন্তু টোয়েন্টি সিক্সের পরে যে টোয়েন্টি সেভেন— এটা বুঝে ফেলেছে।

আমি যদি ওকে ইংরেজিতে না বলে সংখ্যাগুলো বাংলায় বলতাম, ও কি পারতো ছাব্বিশের পরে সাতাশ বলতে?

এবসোলিউটলি নট। ওর বয়স এখন সাড়ে ছয়— সে ছোটোখাটো যোগ-বিয়োগ ধরনের অঙ্কও করতে জানে কিন্তু ছাব্বিশের পরে যে সাতাশ— এটা বারবার বলে দিলেও ভুল করে।

কেন করে?

শিশুরা শুরুতে পৃথিবীর প্রায় কিছুই বোঝে না— সে প্রথম সেন্স মেইক করছে এই পৃথিবীর। কীভাবে করছে? মূলত প্যাটার্ন রিকগনিশানের মধ্যে দিয়ে। সে প্যাটার্নের মধ্যে যে লজিক সেটা ধরে ফেলতে পারে চট করে। কিসের প্যাটার্ন, কোথাকার প্যাটার্ন সে বোঝে না— কিন্তু প্যাটার্নটা সে ধরতে চায়। সে মোটেও বোঝে না সারা ঘরে ময়দা ছিটালে ক্ষতিটা কী— কিন্তু সে জানে যে এই কাজটা করলে মা চোখ বড় করে— বকা দেয়। তাই ইচ্ছা থাকলেও সে বিরত হয়। ভালো খারাপ না বুঝলেও প্যাটার্নটা সে ধরতে পারে।

এই শিশুটিকে এখন বাংলা নিউমেরাল শেখানো হচ্ছে— তার চ্যালেঞ্জগুলো কী একবার চিন্তা করুন। শিশুটার মতো করে চিন্তা করবেন।

এক থেকে দশ পর্যন্ত মুখস্থ করলো— বুঝলাম— কিন্তু দশের পর থেকে এক শ পর্যন্ত কোথাও কোনো লজিক নেই। আপনাকে তের থেকে চোদ্দতে প্রোগ্রেস করতে হোলে ১৩ ও ১৪— দুটো সংখ্যাই মুখস্থ করতে হবে— এর মধ্যে কোনো প্যাটার্ন নাই।

সে লিখছে ৫৭— মানে প্রথমে ৫ তারপর ৭। কিন্তু বলছে সাতান্ন— যেভাবে লিখছে তার উল্টা— মানে প্রথমে সাত (একক)— পরে আন্ন (দশক)। যখন সে সাতান্ন মুখে উচ্চারণ করছে আর অংকে লেখা নাম্বার হিসেবে '৫৭' কল্পনা করছে— এবং এ দুটো কনসেপ্টকে সে মনে মনে জোড়া লাগাচ্ছে— খেয়াল করেছেন যে তাকে আসলে কিছু একটা 'এডজাস্ট' করে নিতে হচ্ছে মনে। আপনি মনে করছেন যে এই সামান্য

এডজাস্টমেন্ট কোনো ‘ব্যাপার’ না। আমার মনে হয় একটা শিশু যখন এই ধরনের এডজাস্টমেন্ট করে নিজের মনে, সাব-কনশাসলি সে মনে করতে শেখে যে অংকের লজিক, অংকের বইতেই শুধু খাটে। ‘লজিক’ ব্যাপারটা যে য়ুনিভার্সাল— সমাজ-বিজ্ঞান বইয়ে যেমন অংক বইতেও ঠিক তেমন— এই অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি সে আত্মস্থ করতে শেখে না।

সে বলছে ঊনষাট অথচ যখন সে ৫৯ লিখছে— অথচ সেখানে ষাটের নামগন্ধও নেই। ষাটের ৬ কিংবা ০ নেই কিন্তু উচ্চারণে ষাট চলে এসেছে— ‘ঊন’ যোগে; বিচিত্র অবস্থা। আপনি মুখে বলছেন এক শ ঊনষাট। তিন ডিজিটের সংখ্যা ১৫৯— কিন্তু তিনটার মধ্যে দুইটা ডিজিট— ৫ ও ৯ উচ্চারণে অনুপস্থিত।

৩ আর ০ মিলে ‘তিরিশ’। আবার ৬ আর ০ মিলে ‘ষাট’। ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাবে তিরিশ আর ষাটের মধ্যে কোনো মিল আছে? আপনিই বলেন। ৩০ এর দশকে একত্রিশ-বত্রিশ বললে suffix ‘ত্রিশ’ এর একটা লজিক চোখে পড়ে; কিন্তু ৬০ এর দশকে একষট্টি-বাষট্টিতে এই যে suffix ‘ষট্টি’— সেটা ষাট না হয়ে কেন ষট্টি হোলো— এটা কি একটা পাঁচ বছরের শিশু বুঝবে?

অদ্ভুত বিষয় হোলো সে চার অংকের সংখ্যা লেখে বাম থেকে ডানে— অর্থাৎ চার হাজার তিন শ বাহাত্তর সে লিখবে ৪, ৩, ৭ ও ২ এই ক্রমে— বাম থেকে ডানে। কিন্তু সংখ্যাটি যদি তিন কোটি চার হাজার তিন শ বাহাত্তর হতো— তাহলে সে ডান থেকে বামে লিখতো গ্রুপে গ্রুপে। প্রথমে ৭ ও ২— তার বামে ৪ ও ৩ বসিয়ে সে একক দশক শতক হাজার গোনা শুরু করবে এবং তিনটা শূণ্য বামে বসিয়ে সর্ববামে ৩ লিখবে। অন্য ভাষার লোকদেরকে এই জগাখিচুড়ি লিখতে আমি দেখি নি। আপনার স্ক্রিপ্ট যদি বাম থেকে ডানে হয়— সব সংখ্যা বাম থেকে ডানে লিখতে পারা উচিত— কী বলেন?

কখনো চিন্তা করেছেন গণিত কী আসলে, কেন শেখানো হয় শিশুদের? গণিত হোলো লজিকের ফিজিকাল এক্সপ্রেশান। লজিক যেহেতু অনেক সময়েই এবস্ট্রাক্ট— বুঝতে কষ্ট হয় বলে আমরা সংখ্যা ও অংকের দ্বারস্থ

হই। কিন্তু বাংলায় যখন একটা শিশুকে প্রথম অংকের সাথে পরিচয় করানো হয়— তার প্রথম শিক্ষা হোলো ১৩ ও ১৪— দুটো সংখ্যাই মুখস্থ করতে হবে। এক থেকে একশ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা য়ুনিক এবং আপনাকে মুখস্থ করতে হবে। ছাব্বিশ কেন ছাব্বিশ— এর উত্তর আপনাকে পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবে না। শিশুটিকে মুখস্থ করতে হবে যে ২ আর ৬ মিলে ছাব্বিশ।

বাংলায় যে শিশুটি অংক শিখছে— তাকে আসলে শেখানোর কথা লজিক— অংক দিয়ে; কিন্তু তার নিউমেরালের মধ্যে কোনো লজিক নেই, কোনো প্যাটার্ন নেই। এবং আপনার আশা এই শিশুটি একটু বড় হলেই 'গণিত' শিখে ফেলবে। এই আশাটুকু সমীচীন কি না, আপনি নিজেই বিবেচনা করুন।

আমার ধারণা বাংলা নিউমেরাল শেখার মধ্যে দিয়ে একটা শিশু আসলে তার লজিকাল মাইন্ডকে, কিছুটা হোলেও সাপ্রেস করতে শেখে।

আপনি যখন ছোটোবেলায় অংক করা শেখেন তখন আপনি মেকানিসটিকালি অংক শেখেন— মানে অংকের ফর্মুলা, কোথায় কোন ফর্মুলা ব্যবহার করবেন— এসব। সেই সাথে আরেকটা জিনিস আপনি সাবকনশাসলি শিখতে থাকেন— এট লীস্ট শেখা উচিত। সেটা হোলো লজিকের য়ুনিভার্সাল এপ্লিকেশন। বাংলায় অংক করা শিখলে ঐ যে পরীক্ষায় পাশ করার বিদ্যা— আমার মনে হয় শুধু ঐ দিকটাই পোক্ত হবে বড় হওয়ার সাথে সাথে। কিন্তু গণিত বই থেকে লজিকের যে য়ুনিভার্সাল এপ্লিকেশন আত্মস্থ করার কথা ছিলো সাব-কনশাস লেভেলে (যেটা শিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য— সাব কনশাসকে প্রভাবিত করা)— সেটা হয়ে ওঠে না।

বলে রাখা ভালো যে ভাষা ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে (যেমন পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষকতার অতি নীচু মান) যেগুলো লজিকের য়ুনিভার্সাল এপ্লিকেশন আত্মস্থ না করতে সাহায্য করে বলে আমার অনুমান— তবে ভাষা যে একটা মূল প্রভাবক সেটা বিশ্বাস করতে চাই।

অনেক স্টাডিতে দেখা গেছে যে চাইনিজরা অংকে ভালো, আমার অভিজ্ঞতাও ঠিক তাই। তা ওদের ভাষায় সংখ্যার প্রোগ্রেশান কীভাবে হয়? আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি ম্যান্ডারিনের কিছুই জানেন না। নীচের টেবেলে আমি কয়েকটা সংখ্যা ম্যান্ডারিন স্ক্রিপ্টে দিলাম, ইংরেজি উচ্চারণসহ। পাশে দিলাম ওই একই সংখ্যাগুলোর বাংলা উচ্চারণ। ম্যান্ডারিনের কিছুই না জেনে আপনি দুই মিনিটের মধ্যে সংখ্যার লজিকটা ধরে ফেলবেন। আপনি যদি বাংলা ভাষাটা না জানতেন তাহলে সংখ্যার লজিকটা ধরতে পারতেন কি না এই তুলনা আপনি নিজেই করুন।

5	五 Wu	৫ পাঁচ
9	九 Jiu	৯ নয়
59	五 十 九 Wu Shi Jiu (Shi ≈ ten)	৫৯ উনষাট
159	一百 五 十 九 Yi Bai Wu Shi Jiu	১ ৫৯ একশ উনষাট
259	二百 五 十 九 Er Bai Wu Shi Jiu	২ ৫৯ দুইশ উনষাট
1159	一千 一百 五 十 九 Yi Qian Yi Bai Wu Shi Jiu	১ ১ ৫৯ এক হাজার একশ উনষাট

আমি জানি আপনি কী ভাবছেন। মানলাম চাইনিজরা অংকে আমাদের চাইতে ভালো কিন্তু তার তো অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন হয়তো ওদের স্কুলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত আমাদের চাইতে ভালো; হয়তো ওরা ছাত্রাবস্থায় আমাদের চাইতে গড়ে বেশী সময় অংক করে, হয়তো ওদের টেক্সটবুকগুলো আমাদের চাইতে ভালো লেখা।

হ্যা— এগুলো প্রত্যেকটাই কারণ হতে পারে ওদের অংকে ভালো হওয়ার পেছনে— অস্বীকার করছি না। এ ধরনের গবেষণায় causal effect নিরূপণ করা অসম্ভব কাজ। তবে ভাষার কারণে আপনার অংক করার সক্ষমতা যে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটা কোনো নতুন ধারণা না। মারিয়া এজওয়ার্থ

সেই ১৭৯৮ সালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, যে ভাষায় আপনি সংখ্যা গুনতে শেখেন সেই ভাষা আপনার অংক করার সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজি ভাষার ইরেগুলার কাউন্টিং সিস্টেমের কারণে ইংরেজিভাষীরা অংকে কাঁচা[১]।

ভাষার কারণে গণিত করার সক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ভাবনা এতোটাই প্রবল ছিলো যে বিংশ শতকে একটি জাতি তাদের নিউমেরাল পুরোপুরি বদলে ফেলে। হ্যা, ওয়েলশরা ১৯৪০ এর দশকে তাদের নিউমেরাল বদলে ফেলে[২]।

বাংলা ইংরেজিসহ বেশীরভাগ ভাষায় সংখ্যাগুলো ডেসিমাল সিস্টেমে– অর্থাৎ দশক হচ্ছে য়ুনিট। কিন্তু সব ভাষায় এই য়ুনিটটা ১০-ভিত্তিক না। যেমন ধরুন ফরাসি ভাষায় সংখ্যাগুলো ২০-ভিত্তিক। ফরাসিতে ৯৬ হোলো quatre vingt seize যার আক্ষরিক মানে 'four twenties and sixteen'। বুঝতে পারছেন যে এই সংখ্যাটা বুঝে বলতে হোলে আপনাকে সামান্য অংক জানতে হবে আগে থেকে। ২০-ভিত্তিক নিউমেরালকে বলে ভাইজেসিমাল সিস্টেম। তা ওয়েলশ ভাষার পুরনো ভাইজেসিমাল সিস্টেম, অংক করার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি:

19– pedwar ar bymtheg– 4 on (5 + 10)

79– pedwar ar bymtheg a thrigain– 4 on (5 + 10) *and* (3 x 20)

88– wyth a phedwar ugain– 8 *and* (4 x 20)

ব্যাখ্যাগুলো দেখলেই বুঝবেন যে ২০-ভিত্তিক ভাইজেসিমাল সিস্টেমে মোটামুটি বড় একটা সংখ্যা প্রকাশ করতেই ছোটোখাটো অংক করতে হয়। সংখ্যাগুলো নিজেরাই আসলে একেকটা য়ুনিক ফর্মুলা। প্রত্যেকটা সংখ্যার প্রকাশ পৃথিবীতে কোনো বইয়ে লেখা থাকে না। আপনাকে একটা নিয়ম শিখিয়ে দেয়া হয় সেই নিয়ম অনুযায়ী আপনি একটা বড়

---

১. *Practical Education* by Maria Edgeworth; Vol-1. London. 1798.

২. Anand Jagatia; BBC Future, 23rd November 2019. Why you might be counting in the wrong language.

সংখ্যা তৈরি ও উচ্চারণ করেন। বাংলা ভাষায় যেমন ১ থেকে ১০০ জেনে ফেললে বাকী সংখ্যাগুলো মোটামুটি প্যাটার্ন মানে (যদিও আপনি মিলিয়নকে কখনোই নিযুত বলেন না)। কিন্তু ভাইজেসিমাল সিস্টেমে এই নিয়মগুলো শিখতে পারাটাই একটা চ্যালেঞ্জ এবং তার চেয়েও বড় সমস্যা হোলো— বড় সংখ্যা খুব বেশী জটিল হয়ে যায়— যেটা ফলো করা কঠিন।

ওয়েলশরা ২০-ভিত্তিক ভাইজেসিমাল সিস্টেম থেকে বেরিয়ে ১৯৪০ এর দশকে ডেসিমাল সিস্টেমে প্রবেশ করে। ডেসিমাল সিস্টেমে তাদের সংখ্যাগুলো প্রায় ম্যান্ডারিনের লজিক মানা শুরু করে (নীচের টেবেলে উদাহরণ দেয়া হোলো)। পূর্ব এশিয়ার ভাষাগুলোতে সংখ্যা তৈরি করার নিয়মকে ট্রান্সপেরেন্ট সিস্টেম বলে। কারণ এই ভাষাগুলোতে আপনি অল্প কয়েকটা সংখ্যা (১ থেকে ৯) মুখস্থ করলে আর কয়েকটা নিয়ম জানলে বাকি যেকোনো সংখ্যা নিজে নিজেই তৈরি করতে পারবেন— মুখস্থ করতে হবে না। বলে রাখা ভালো যে ইংরেজি নিউমেরাল কিন্তু ট্রান্সপেরেন্ট না— তবে মোটামুটি একটা লজিক কাজ করে।

	Dutch	Welsh
5	Vijf	Pump
9	Negen	Naw
59	Negenenvijftig	Pum Deg Naw
159	Honderd Negenenvijftig	Cant Pum Deg Naw
259	Tweehonderd Negenenvijftig	Dau Gant Pum Deg Naw
1159	Duizend Honderd negenenvijftig	Mil Cant Cant Pum Deg Naw

ভাষা যে আসলেও গণিত করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করে এটা পরীক্ষা করার একটা চমৎকার জায়গা হোলো ওয়েলস। কারণ ওয়েলসের প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্র ইংরেজিতে অংক শেখে; বাকী ২০ ভাগ মডার্ন ওয়েলশে। এখানে তুলনা চলে কারণ একই দেশ বলে ছাত্র ও শিক্ষকদের সোসিও-একেনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড তুলনাযোগ্য; স্কুলের নিয়মকানুনও একই রকম— শুধু গণিত শিক্ষার ভাষা ভিন্ন। দেখা গেছে যে যারা ওয়েলশে অংক শেখে

তাদের নন-ভার্বাল নাম্বার এস্টিমেশনের সক্ষমতা ইংরেজিতে অংক শেখাদের চাইতে বেশী - যদিও উভয়ের পাটিগণিত করার সক্ষমতা একই পর্যায়ের[৩]।

অন্যদিকে ডাচ ভাষায় সমস্যাটা বাংলার মতো। ঐ যে বলছিলাম সাতান্ন উচ্চারণে ৭ আগে কিন্তু যখন লিখবেন তখন ৫ আগে। একই ভাবে ডাচ ভাষায় ৫৭ হোলো zevenenvijftig। বুঝতেই পারছেন আগে zeven (৭) পরে vijftig (৫০)। আরো উদাহরণ দেয়া হয়েছে ওপরের টেবেলে। এই যে উল্টো করে বলা এর কারণে কি ডাচদের অংক করার সক্ষমতা কমে যায়? আগেই বলেছি এ ধরনের সমস্যায় কোনো causal effect বের করা অসম্ভব যেহেতু অনেক অনেক অজানা বিষয় আপনার ফলাফলকে প্রভাবিত করবে। তবে একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ডাচ কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চারা দুই ডিজিট নাম্বারের যোগ করার ক্ষমতায় ইংলিশ কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের চেয়ে পিছিয়ে— যদিও এই পরীক্ষার ডাচ শিশুরা ইংলিশ শিশুদের চাইতে বয়সে বড় ছিলো[৪]।

আমার অনুমান বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষ যে অংককে ভয় পায় তার একটা মূল কারণ হোলো বাংলায় অংক শেখা। বাংলা নিউমেরাল ট্রান্সপেরেন্ট না। শিশুদের অংক শেখানোর জন্য বাংলা নিউমেরাল ভীতি সঞ্চারক।

সমাধান

এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই। আমি একটি নতুন ট্রান্সপেরেন্ট নিউমেরাল সিস্টেম প্রস্তাব করবো। এই নিউমেরাল সিস্টেম শিখতে আপনাদের দশ মিনিট লাগবে এবং এরপরে

৩. Ann Dowker and Manon Roberts; Front. Psychol., 07 July 2015. Does the transparency of the counting system affect children's numerical abilities?

৪. Iro Xenidou-Dervou, Camilla Gilmore, Menno van der Schoot and Ernest C. D. M. van Lieshout. Front. Psychol., 29 April 2015. The developmental onset of symbolic approximation: beyond nonsymbolic representations, the language of numbers matters.

আপনি যেকোনো সংখ্যা তা যতো বড়ই হোক কিংবা ছোটো– একই নিয়ম মেনে লিখতে পারবেন। সংখ্যাটি যতো বড়ই হোক– সেটি বাম থেকে ডানে যেভাবে বলেন– ঠিক সেভাবেই লিখিত হবে।

আমার প্রথম পরিবর্তনটি হোলো: এক থেকে নয়– এই নয়টি সংখ্যা এক সিলেবলে উচ্চারণ করতে হবে। এর কারণ হোলো এই নিয়মে ৯ এর পরে প্রতিটি সংখ্যা– ১১ কিংবা ১১৩৫৬৭– আপনাকে একই নিয়মে বাম থেকে ডানে তৈরি করতে হবে। এক সিলেবলের সংখ্যার সাথে আপনি suffix যোগ করে করে বড় সংখ্যা তৈরি করবেন। প্রতিটি ০ একটি দুই শব্দের সংখ্যা নির্দেশ করে। বুঝিয়ে বলি।

এক থেকে নয়কে আমি বলছি এ, দু, তি, চা, পা, ছো, সা, টে এবং নো। এই নয়টি সংখ্যাগুলোর সংক্ষেপনের ক্ষেত্রে আমি বিবেচনা করেছি সংখ্যাগুলোর ইন্দো-য়োরোপীয়ান রুট ও ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রতিটি উচ্চারিত সংখ্যার য়ুনিকনেস। আমার লক্ষ্য ছিলো অবশ্যই সংখ্যাটি এক সিলেবলে নিষ্পন্ন হবে এবং এখন যে উচ্চারণ করছেন– অর্থাৎ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট এবং নয়– এই নয়টি উচ্চারণের চাইতে খুব বেশী যেন আলাদা না হয়।

এরপরের চিন্তা হোলো আপনি কীভাবে এক ডিজিট থেকে দুই ডিজিটে যাবেন? খুব সহজ। suffix হিসেবে 'শ' যোগ করে। দশ হবে এ+শ = এশ; বিশ হবে দু+শ = দুশ। ২৩ হবে দুশ তি। ৯৪ হবে নোশ চা।

আপনি তিন ডিজিটের সংখ্যা কীভাবে তৈরি করবেন?

সেক্ষেত্রে আপনি প্রথমে 'ডে' এবং পরে 'শ' suffix যোগ করবেন। ২২৩ হবে দুডে দুশ তি। ৬৯৮ হবে ছোডে নোশ টে।

চার ডিজিট হোলে suffix যোগ করবেন 'জা'। ৫৬২০ হবে পাজা ছোডে দুশ। কিন্তু এভাবে লিখলে বড় সংখ্যাগুলো খুব বেশী লম্বা হয়ে যাবে না? আসুন তুলনা করি।

৭৮৩৯০২ = শালি টেয়ু তিজা নোডে দু (সাত লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শো দুই)

৩২০০৬৫৩২ = তিকো দুমি ছোজা পাড়ে তিশ দো (তিন কোটি বিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো বত্রিশ)

১১৫৯ = এজা এড়ে পাশ নো (এক হাজার একশ ঊনষাট)

নীচের টেবেলটা খেয়াল করলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন এই নিউমেরাল সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করবে।

	Suffix =>	দশক শ	শতক ড়ে	হাজার জা	অযুত যু	লক্ষ লি	মিলিয়ন মি	কোটি কো
১	এ	১০ এশ						
২	দু		২০০ দুড়ে					
৩	তি			৩০০০ তিজা				
৪	চা				৪×১০^{৪} চাযু			
৫	পা					৫×১০^{৫} পালি		
৬	ছো						৬×১০^{৬} ছোমি	
৭	সা							৭×১০^{৭} সাকো
৮	টে							
৯	নো							

প্রশ্ন করতে পারেন এই suffix আর সংখ্যাগুলো বাছাই করা হয়েছে কীভাবে? নীচে উল্লেখ করা হোলো।

'এক' থেকে 'এ': ইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষাগুলোতে এক-নির্দেশক শব্দে স্টেম হিসেবে 'se- (sem-, sm-)' এর ব্যবহার খুবই কমন। সংস্কৃতে 'সহস্র' মানে এক হাজার (হাজার না)। আবার oi- স্টেম থেকে ইংলিশে 'one', সংস্কৃতে 'এক', ল্যাটিনে unus এসেছে। এক সিলেবলের উচ্চারণ দিয়ে 'এক' কে নির্দিষ্ট করতে হোলে বাংলা ভাষাভাষীদের 'স', 'ক' এবং

‘এ’ সবচাইতে কম ধাক্কা লাগবে বলে আমার অনুমান। আমি ‘এ’ বেছে নিয়েছি যেহেতু এ’র উচ্চারণ vowel এর মতোন এবং যেহেতু ‘এ’ দ্বারা শব্দ কম্পাউন্ড করা সহজতর।

‘দুই’ থেকে ‘দু’: ল্যাটিনে duo এবং সংস্কৃতে ‘দ্বিতীয়’ এসেছে কমন স্টেম ‘dwo-’ ও ‘dwi-’ থেকে। বাংলাতে ‘দুই’ নির্দেশক এক সিলেবলের উচ্চারণ ‘দু’ বা ‘দ্বি’— দুটোই হতে পারে। আমি ‘দু’ বেছে নিয়েছি ‘দুই’ থেকে।

‘তিন’ থেকে ‘তি’: বেশীরভাগ ইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষায় ‘তিন’ এর নির্দেশ করে ‘tr-’ স্টেম। ইংরেজিতে triple, trident, trinity; সংস্কৃতে তৃতীয়, স্প্যানিশে tres, ইটালিয়ানে tre একই স্টেম থেকে আসা। তিন এর সংক্ষেপণ ‘ত্রি’ হোলে সবচেয়ে ভালো হতো বলে আমার ধারণা। যুক্তাক্ষর উচ্চারণের প্রতিভা সবার সমান না দেখে ‘তি’ তে সন্তুষ্ট থাকতে হোলো।

‘চার’ থেকে ‘চা’: বাংলায় ‘চার’ এর সংস্কৃত চতুর্থ— এক্ষেত্রে কমন স্টেম হোলো ‘tur-’ (তুরীয়=চতুর্থ)। ‘tur-’ স্টেমে সে অর্থে ইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষাগুলোতে চার এর প্রকাশ খুব বেশী নাই। এই বিবেচনায় ‘চার’ থেকে ‘চা’ রাখা হোলো।

‘পাঁচ’ থেকে ‘পা’: সংস্কৃতে ‘পঞ্চ’। ‘pe-’ এবং ‘enk-’ দুটো স্টেম অনেক ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। ফরাসিতে cinq, ল্যাটিনে quinque সম্ভবত একই উৎস (nk) থেকে আসা। বাংলা ভাষাভাষীরা ৫ এর সাথে ‘প’ এর যোগসূত্র সহজেই দেখতে পাবে।

‘ছয়’ থেকে ‘ছো’: ইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষায় ‘ছয়’ এর নির্দিষ্ট কমন স্টেম পাওয়া যায় না। ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাবে ‘ছয়’কে ‘ছ’, ‘ছা’, ‘ছে’ বা ‘ছো’ দিয়ে প্রকাশ করা যেতো। শব্দ কম্পাউন্ড করার ক্ষেত্রে সহজতর হবে বলে আমি ‘ছো’ প্রস্তাব করছি।

‘সাত’ থেকে ‘সা’: ইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষায় কমন স্টেম ‘sept-’ এবং ‘sep-’ থেকে ‘সাত’ এসেছে অনেক ভাষায় (ল্যাটিনে septem, সংস্কৃতে সপ্তম, ফরাসিতে sept)। অইন্দো-য়োরোপীয়ান ভাষা যেমন আরবী

(sab'(un)), হিব্রুতেও (seva') কাছাকাছি শব্দ দিয়ে 'সাত' প্রকাশ করা হয়। সঙ্গত কারণে 'সাত' এর জন্যে 'সা' প্রস্তাব করছি।

'আট' থেকে 'টে': এক সিলেবলে আটের সংক্ষেপণ সহজ না। অনেকগুলো স্টেম আছে। ল্যাটিনে 'okt-' (octo) আছে, সংস্কৃতে 'ok-' (অষ্ট) আছে। আপনি বলতে পারেন যে 'ষ্ট' হতে পারে আটের আদর্শ সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দের শুরুতে 'ষ্ট' উচ্চারণ করা ভারতীয় ভাষার মানুষদের জন্য সহজ না। অন্যদিকে আটের 'আ' বিবেচনা করা হয়েছিলো। শব্দের শুরুতে 'আ' থেকে 'টে'র উচ্চারণ বেশী নির্দিষ্ট বলে 'টে' প্রস্তাব করছি।

'নয়' থেকে 'নো': কমন স্টেম 'newn-'। ল্যাটিনে novem, সংস্কৃতে নবম, ইংলিশে nine, জার্মানে neun। শব্দ কম্পাউন্ড করার ক্ষেত্রে 'ন' থেকে 'নো' বেশী সম্ভাবনাময় মনে করা হোলো।

শ: বাংলা দুই ডিজিটের নাম্বার উচ্চারণে সবচাইতে কমন কনসোনেন্ট হোলো 'sh-'। বাংলায় দুই ডিজিটের সংখ্যা আছে মোট ৯০টি। উচ্চারণে 'sh' কনসোনেন্টের উচ্চারণ আসে এর মধ্যে মোট ৫৯ টি সংখ্যায়। 'দশক' থেকে 'দ' ও 'ক' বাদ দিয়ে 'শ'টা রাখা হোলো তাই।

ডে: 'শতক' এর থেকে 'ত' কে suffix হিসেবে গ্রহণ করা যেতো। সমস্যা হোলো 'ত' কে suffix হিসেবে গ্রহণ করলে বহু সংখ্যায় উচ্চারণটি উহ্য থেকে যাবে। তিন ডিজিটের সংখ্যা ১০০ থেকে ৯৯৯— মোট নয়শোটি সংখ্যায় এই suffixটি উচ্চারিত হবে। স্পষ্ট উচ্চারণের লক্ষ্যে আমি 'ত' থেকে 'ডে' বেশী উপযোগী মনে করেছি।

জা: 'হাজার' থেকে 'জা'।

যু: 'অযুত' থেকে 'যু'।

লি: 'লক্ষ' থেকে 'ল' নেয়াটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সংখ্যা কম্পাউন্ড করতে হোলে suffix 'ল' পরবর্তী সংখ্যার সাথে উচ্চারণে মিলিয়ে যায়। সংখ্যার উচ্চারণ ডিস্টিঙ্কট রাখার জন্যে 'ল' না নিয়ে 'লি' নিয়েছি।

মি: নিযুত না নিয়ে আমি ইংরেজি ভাষার মিলিয়নকে ধর্তব্যে এনেছি যেহেতু মিলিয়ন, নিযুত থেকে অনেক বেশী ব্যবহৃত। বাংলাতেই বিদেশী

সংখ্যার ব্যবহারের উদাহরণ আছে। আমরা সংস্কৃত সহস্র না বলে ফার্সি 'হাজার' বলি। মিলিয়ন থেকে 'মি' রাখা হোলো।

কো: কোটি থেকে 'কো'।

শেষ কথা

বাংলা নিউমেরাল সিস্টেম ট্রান্সপেরেন্ট হোলে কি ঘরে ঘরে ভন নয়মেন জন্ম নেবে? অবশ্যই না। সেটা কোনো কাজের প্রশ্নও না। কাজের প্রশ্ন হোলো— নিউমেরাল সিস্টেম ট্রান্সপেরেন্ট হোলে বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অংকের যে সক্ষমতা (গড় মান)— সেটা বাড়বে কি না? আমার ধারণা, নিউমেরাল সিস্টেম ট্রান্সপেরেন্ট হোলে শিশু বয়সে মানসাঙ্কের ক্ষেত্রে, এবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টকে বোঝার ক্ষেত্রে ও নন ভার্বাল নাম্বার এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। এই সুবিধা সারা জীবন কার্যকর থাকে বলে আমার অনুমান।

পুরো একটা ভাষার নিউমেরাল সিস্টেম বদলানোর চাইতে সরাসরি ইংরেজি নিউমেরাল ব্যবহার করা কি বেশী রিয়ালিস্টিক সমাধান না? অবশ্যই। কিন্তু সেই সমাধানে চিন্তার কি সুযোগ বলুন? কল্পনাই যখন করছি, বিরিয়ানিই সই। ইংরেজি নিউমেরাল ট্রান্সপেরেন্ট না। ইংরেজির চাইতে ভালোটাই তো করা যায়। তবে হ্যা— শুধু থট এক্সপেরিমেন্টে।

একটি অনুরোধ রইলো সবার শেষে। এই লেখায় প্রস্তাবিত নিউমেরাল সিস্টেম, প্রচলিত নিউমেরাল সিস্টেম থেকে কার্যকর কি না সেটা পরীক্ষা করার কোনো উপায় আমার জানা নেই। আপনারা যারা প্রবাসী— যাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে কখনোই বাংলা শিখবে না এবং বাংলায় কোনো পরীক্ষা দেবে না কোনোদিন— তাদেরকে খুব ছোটো বয়সে এই নিউমেরাল সিস্টেমটা শেখানোর অনুরোধ করছি। তারা যদি ইংরেজি নিউমেরাল সিস্টেমের চেয়ে এই নিউমেরাল সিস্টেম সহজে শিখতে পারে— তাহলে সম্ভবত এটা কাজের।

২০১৯

শাহবাগীদের দেশপ্রেম

এই শিরোনামের জন্য আমি লজ্জিত এবং একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন বলে মনে করি। 'শাহবাগী' বলতে হালকাভাবে যাদের নির্দিষ্ট করা হয় তারা অনেকেই এই নামে ডাকাটাকে অপমানজনক মনে করেন। তবে এই বিশেষ গোষ্ঠীকে 'শাহবাগী' ভিন্ন অন্য যেসব শব্দে বিশেষায়িত করা হয় যেমন চেতনা-ব্রিগেড, চেতনাইজড— সেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশী আপত্তিকর মনে হয়েছে। আমার বিচারে এ লেখায় অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিকর বিশেষ্যটিতে আস্থা রাখা হোলো— আশা করি আপনারা স্পোর্টিংলি নেবেন।

প্রথম নোক্তা: কারা শাহবাগী?

মজলিশে, অনেকগুলো মেয়ের মাঝে সুন্দরীতমাটি কে— শনাক্ত করাটা কঠিন না— সবাই ঠিক জেনে যায় চোখের পলকে— কিন্তু ব্যাখ্যা করাটা কঠিন। শাহবাগী কে, আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না এতোটুকু— তবে ব্যাখ্যা করাটা ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন। চেষ্টায় কোনো অরুচি নেই। আমি একটা এসিড টেস্ট বের করেছি— 'শাহবাগী' শনাক্ত করবার। অনেকটা সাইকোলজিকাল টেস্টের মতোন প্রশ্ন।

ধরা যাক (আবারও বলছি— ধরা যাক। বাস্তবে এই অবস্থা তৈরি হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই) সৌদী আরব বললো যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করতে হবে। যদি না করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের সব শ্রমিকদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। কথার কথা হিসাবে ধরে নিচ্ছি যে বাংলাদেশের রেমিটেন্সের ৮০ ভাগ আসছে সৌদি আরব থেকে এবং রেমিটেন্স বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আয়ের খাত— অঙ্কের হিসাবে

জিডিপির ৫০ শতাংশ। এমন অবস্থা হোলে আপনি কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার পক্ষে থাকবেন?

আমার পরিচিত যে কজন শাহবাগীকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই বলেছেন যে না, বিচার বন্ধ করা যাবে না। বাকীরা স্বাভাবিক অবস্থায় যুদ্ধাপরাধের বিচার চাইলেও এমন অবস্থায় পিছু হটবেন। (দয়া করে এটাকে আক্ষরিক অর্থে এসিড টেস্ট মনে করবেন না– এটি আমার পর্যবেক্ষণ মাত্র)

অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধের বিচারকে শাহবাগীরা স্থান, কাল, পাত্র, বাস্তবতা এসবের ঘেরাটোপে বাধতে রাজী নন। এই দাবী এবং এই প্রসঙ্গটি তাদের কাছে একটি আইনী প্রসঙ্গ যতোটুকু তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী একটি 'পবিত্র' বিষয়, 'চেতনার' বিষয়। স্পষ্টতই যে অপরাধ তারা নিজেরা করেন নি (অর্থাৎ চল্লিশ বছর ধরে বিচার না হওয়াটা) সে অপরাধের দায়ভার নিজেদের ওপর চাপিয়ে তারা উচ্চ নৈতিকতায় আক্রান্ত হন (তারা প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন) এবং সেই অপরাধের শাস্তি চাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ/পবিত্র করে তুলতে চান। পুরো ব্যাপারটাকে তারা প্রচুর সিম্বলিজম এবং ছমছমে সংস্কার সহযোগে ধর্মাচারের খুব কাছাকাছি নিয়ে যান। একই ঘরানার জজবা আমি লক্ষ্য করেছি কট্টর শিয়া ও ক্যাথোলিকদের মাঝে– তবে শাহবাগীদের জজবা এখনও অতোটা ঘন হয় নাই।

আমি এই মানুষগুলোকে খুব গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ করি, বোঝার চেষ্টা করি। যে বিশেষত্ব আমি সবসময় লক্ষ্য করি তা হোলো– দেশ, ৭১, গণতন্ত্র, জামাত, পাকিস্তান, বঙ্গবন্ধু এবং ছাগু– এসব শব্দের উপর্যুপরি ব্যবহার। এই মানুষগুলো দশ বছর আগে 'গণতন্ত্র' ও 'মানবতা'– শব্দদুটি প্রচুর ব্যবহার করতেন– প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে অন্তত একবার চেহারা দেখিয়ে যেতো। আজকাল শব্দদুটি প্রাক্তন প্রেমিকের মতো– মুখে আনলে লোকে লজ্জা দিতে পারে।

হঠাৎ দেখলে, প্রথম জানলে যেকোনো সচেতন পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে তারা গণতন্ত্র, পশ্চিমা 'উদারনৈতিক' মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমকে খুবই উচ্চ আদর্শ মানেন এবং সে মতে অনুশীলনও করেন। কিন্তু বাস্তবটা ভিন্ন। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হোলে তাদের প্রত্যেকের প্রিয় রাজনৈতিক দল

আওয়ামী লীগকে শেখ হাসিনা যে একটি এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহ গোত্রে পরিণত করেছেন তার বিরুদ্ধে অন্তত একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান নেয়ার কথা ছিলো।

আওয়ামী লীগের হয়ে এলেকশান করা এক রাজনীতিবিদ আমাকে বলেছেন যে শেখ হাসিনার চেয়ে বড় একনায়ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো আসে নি। যতো বড় একনায়কই হোক, অন্তত পার্টি-মেন কিংবা জেনারেলদের সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত দেন। সিনিয়র মেম্বারদের মতামত আপনি নেবেন কি না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু একনায়করা অন্তত আলোচনা করেন। শেখ হাসিনা এ প্রয়োজনটুকুও বোধ করেন না। দলের মহাসচিবও জানেন না তিনি কী করবেন।

তাদের প্রিয় দলের নেত্রী যে শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পুরো দেশটাকে বিস্ফোরণমুখ করে ফেলেছেন এবং এর দায়ভার যে প্রায় এককভাবে তার— এই কথা কোনো সুস্থ মানুষ অস্বীকার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নন-রেসিডেন্ট শাহবাগী, যাদের অনেকেই খুব ভালো পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় ডিগ্রী করছেন; তারাও কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। এমন কি অনেকে এখনও এই বিষয়ে হাসিনাকে সমর্থনও করেন। এতো মানুষ মারা যাচ্ছে এক ব্যক্তির এরকম গোয়ার্তুমির কারণে— দেশপ্রেমিক হোলে এই অবস্থা জাস্টিফাই করার কথা ছিলো না। নিজেরা যে দেশে এখন আছেন সে দেশের গণতন্ত্রে তাদের প্রবল আস্থা কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্র না থাকাটাকেই তারা ভীষণ উপযোগী মনে করছেন।

আবার দেখুন তাদের নিজেদের আন্দোলন আসলে কী ছিলো— কার্নিভাল না সুধী সমাবেশ— এই মীমাংসাতেও তাদের কোনো আগ্রহ দেখা যায় নাই।

প্রথম যারা শাহবাগকে মানচিত্রে আনেন, তারা নিজেদের আওয়ামী লীগের গুটি হিসেবে দেখেন নাই। আবার এটাও বোঝেন নাই যে পুলিসি প্রোটেকশানে আর যাই হোক, আন্দোলন হয় না। তারা পুরো শাহবাগ আন্দোলনকে দেখতে চেয়েছিলেন 'অরাজনৈতিক' দৃষ্টিকোণ এবং অতি সরলীকৃত শিশুতোষ আকুতি থেকে। অনেকেই আবার মনে করেছেন যে

এই আন্দোলন আওয়ামী-বিএনপি রাজনীতির প্রত্যুত্তর। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে দাবী একটি থাকলেও ধীরে ধীরে এর সাথে অনেক দাবী যুক্ত হয় যেমন ইসলামিস্ট নেতাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বন্ধ কিংবা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবী।

এই পর্যায়ে সবচেয়ে প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ করে বাংলাদেশের মেইনস্ট্রীম মিডিয়া এবং ওপিনিয়ন মেকাররা— পলিটিকালি কারেক্ট থাকার আকাঙ্ক্ষায় ও পাবলিক সেন্টিমেন্টের চাপে অতি মৌলিক কিছু প্রশ্ন তারা করেন নি, আইনের দিকগুলোও তারা আলোচনা করেন নি। যেমন বিচারের দাবীর আন্দোলন অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ফাঁসির দাবী করলে সেটা বিচারের দাবী না একটি নির্দিষ্ট রায়ের দাবী হয়ে যায়— সেটা নিয়ে তারা কোনো প্রশ্ন করেন নি। একটি বিচারের রায় হয়ে যাওয়ার পর আইন সংশোধন করে রেট্রোস্পেক্টিভলি আদৌ বিচার করা যায় কি না এবং করলেও সেটা উচিত হবে কি না এ প্রসঙ্গে আইনবিশারদরা প্রায় কিছুই আলোচনা করেন নি। এমন কি শাহবাগে শিশুদের এনে ফাঁসির কনসেপ্টের সাথে পরিচিত করাটা ঠিক কি না, কালচারাল এপ্রোপ্রিয়েশানের এমন সাধারণ প্রশ্নও তোলা হয় নি। অনলাইন এক্টিভিস্টরা তাদের ন্যারেটিভ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নও সে সময়ে শুনতে রাজী ছিলেন না। তারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে ট্রাইবুনালের সমালোচনার একমাত্র ব্যাখ্যা রাজাকারদের পক্ষ নেয়া না। মজার ব্যাপার হোলো, যে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবীতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত সেই দাবীটিই তাদের চূড়ান্ত ছয় দফার মধ্যে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়।

এসব পর্যবেক্ষণ থেকে আমি প্রথমত এই সিদ্ধান্তে আসি যে আওয়ামী লীগের পক্ষে এমন কোনো ভুলই করা সম্ভব না যার কারণে শাহবাগীরা তাদের সমর্থন তুলে নেবেন এবং বিএনপির পক্ষে এমন কোনোই ভালো কাজ করা সম্ভব না যার কারণে তাদের সমর্থন করা যায়। চল্লিশ বছর আগে যে যা করেছে, সেটিই চূড়ান্ত ও পরম। অনুভব করি— যদিও ধর্মের ব্যাপারে তাদের সজাগ অরুচি সবসময় লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না, রাজনৈতিক সমর্থনের ব্যাপারে তারা নিজেরা কিন্তু কেবল ধার্মিকদের মতোন আচরণ করতেই সক্ষম। বাঙালির জীবনে ধর্ম মাত্রই সতত

সজীব– যেকোনো বিষয়কে ধর্মে উপনীত করার বিরল প্রতিভাকে বাঙালি সামান্য লৌকিকতা বলে জ্ঞান করে।

বিএনপির সমর্থকদের মধ্যেও আমি একই ধরনের প্রবণতা দেখেছি। বোধ করি বুদ্ধিবৃত্তির এই নাজুক অবস্থা বাঙালির জীবনে অভিনব না। তবে কিছুটা অভিনব লেগেছে দেশ ও দেশপ্রেম– এই বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে দেখেন। MIT'র ল্যাবে বসে পৃথিবী বদলে দেয়ার বদলে ৭১ এর জুলাই মাসে মেহেরপুরে কতো রাউন্ড গুলি করা হয়েছিলো, কিংবা লায়লপুর জেলে শেখ মুজিবর রহমানকে দৈনিক কতো ক্যালোরি বঞ্চিত করা হয়েছিলো– এই চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে ওঠাটা এক বিচিত্র অবিশেষায়িত সক্ষমতার নাম– এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

তা এই অনুভূতিকে কি আমরা দেশপ্রেম বলবো?

কোনোমতেই না। কারণ এই একই মানুষ ঘটমান বর্তমানে নিজের দেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পুলিশ বাহিনীর গুলি চালানোকে মনে করেন কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ, এই একই মানুষ ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেন অথচ বর্তমান বছরের সেই দিনেই বিরোধী মতের রাজনীতিবিদ গুম হোলে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেন না। শুধুমাত্র বিএনপি কিংবা জামাত করার কারণে রাষ্ট্র এখন বহু সাধারণ কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে তা ক্ষেত্র বিশেষে ৭১ এর চেয়েও ভয়াবহ কিন্তু এসব ব্যাপারে তারা 'মতিকণ্ঠ' করেন।

দেশের অর্ধেকের চেয়ে বেশী মানুষকে বাদ দিয়ে 'দেশপ্রেম' করা যায় কি?

তাহলে তারা যা করেন সেটা কি?

আমার ধারণা শাহবাগীরা এসেনশিয়ালি তাদের পছন্দের একটা মেইক-বিলিভ ওয়ার্ল্ডে বাস করেন। এই 'থাকার' একটা বিশেষত্ব আছে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাদের কিছু আইডিয়া, কিছু টোটেম, কিছু মাসকট, কিছু ইভেন্ট আছে যেগুলোকেই তারা বাংলাদেশ বলে মনে করেন। ব্যাপারটা বোঝানো একটু কঠিন– তবু চেষ্টা করি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন– এতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু শাহবাগীদের সাইকোএনালিসিস করলে আমার ধারণা, দেখা যাবে যে দাড়িপাল্লার এক পাশে বাংলাদেশ, আরেক পাশে মুক্তিযুদ্ধ রাখলে তারা মুক্তিযুদ্ধ নামক 'ইভেন্ট'টিকে বাংলাদেশের চাইতেও বড় মনে করবেন। আরো গহীনে গেলে আমার মনে হয় দেখা যাবে যে ৭১ এর আসল ঘটনা না, মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভটাই তাদের কাছে সবচেয়ে প্রেশাস। কারণ মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস কী তার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হোলো এই ন্যারেটিভটাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তারা নিজেদের পবিত্র, নৈতিক, মহান— এসব মনে করতে পারেন। তারা তাদের 'দেশের' এমন 'আলাদা বিষয়গুলোকে' প্রবলভাবে ভালোবাসতে সক্ষম কিন্তু বিষয়গুলো এক করতে পারেন না— সেজন্যই সেটা মেইক-বিলিভ ওয়ার্ল্ড।

কেন এমন হয়?

আমার ধারণা 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটিকে দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে ভালোবাসা খুব কঠিন— বিশেষ করে এখন যাদের বয়স ৩০ এর কম তাদের জন্য। কোনো অসুন্দর জিনিস দীর্ঘদিন ভালোবাসা যায় না। যারা আগ্রহী তারা ষাট, এমন কি আশির দশকের ঢাকার স্টিল ফোটোগ্রাফ দেখতে পারেন। ছিমছাম, প্রায় গোছানো কারো-কারো-কাছে-অপূর্ব-সুন্দর এক নগরী। মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বইয়ে (প্রকাশকাল জুন '৭১— সম্ভবত) কাজী আনোয়ার হোসেন ঢাকাকে উল্লেখ করছেন 'রমনীয়' ঢাকা বলে। সুন্দরকে ভালোবাসা যায়, ভালোবাসতেই হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের বাবাদের প্রজন্ম যে যুদ্ধ করেছিলেন তার মূল কারণ ছিলো তারা তাদের মেমোরীকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, যে মেমোরী হোলো তাদের শৈশব ও কৈশোরের 'সুন্দর' একটা দেশ, যাকে রক্ষা করা যায়, করতে হয়। কিন্তু আজকের ঢাকা কুৎসিত, পুরো দেশে শুধু মানুষ আর মানুষ, চারদিকে শুধু কংক্রিট। মানুষগুলোও বদলে গেছে— মুদির দোকানী থেকে প্রধানমন্ত্রী, সবাই অকারণে যখন-তখন মিথ্যা বলছেন। টিভি খুলবেন— বাজে খবর, পত্রিকা খুলবেন তো ভয়ঙ্কর খবর। দেশটার দিকে যে একটু অন্য চোখে তাকাবেন, সেই সময়টুকুও নেই।

কার্যকারণের সমন্বয় খুঁজতে গেলে এই দেশকে ভালোবাসা, রীতিমতো এক এইচএসসি পরীক্ষা।

কিন্তু স্কুলে আপনাকে প্রাইম করা হয়েছে দেশকে ভালোবাসার জন্য। ইসলাম শিক্ষায় পড়েছেন 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ', বাংলা বইয়ে পড়েছেন 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'। নিজের ভাইকে যদি আপনি ভালো না বাসেন আপনি বড়জোর হৃদয়হীন মানুষ, কিন্তু খারাপ নন। অন্য দিকে নিজের দেশটাকে যদি ভালো না বাসেন, আপনি 'অনৈতিক' মানুষ। 'দেশপ্রেম না থাকা' আর 'বিশ্বাসঘাতকতা' বিপজ্জনক রকমের কাছাকাছি বিষয়।

আপনার মনের শিক্ষিত অংশ বলছে দেশকে ভালোবাসতে হবে কিন্তু ইন্সটিঙ্কটিভ অংশ প্রশ্ন করছে এই দেশকে কি ভালবাসা যায়?

তা এই টানাপোড়েনের প্রতিক্রিয়া কী? আপনি পেছনে তাকাবেন এবং এমন কিছু ব্যক্তি, ইভেন্ট ও ধারণা বেছে নেবেন যার একটা অতি সরল ন্যারেটিভ আছে এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়গুলোকেই বাংলাদেশ বলে ভাবতে শুরু করবেন (সেহেতু তা 'রক্ষা' করা যায়)। এটাই দেশপ্রেম, এটাই চেতনা।

আমার ধারণা শাহবাগীরা এই ভাবেই দেশটাকে দেখেন।

এর একটা খুব বড় সুবিধা আছে। যেহেতু আপনার 'দেশ' আসলে আলাদা আলাদা কিছু ইভেন্ট এবং যেহেতু এই ইভেন্টগুলো বাস্তবতার ঊর্ধ্বে (আপনার কাছে) সেহেতু এই ইভেন্টগুলো নিজেরা খুবই ফ্লুয়িড। যেকোনো ব্যাখ্যা, যেকোনো নির্দেশ যতোক্ষণ আপনার পক্ষে যায়, মনে হবে যে এটাই সত্যি। আগ্রহীরা হয়তো দেখেছেন যে দেওয়ানবাগী পীর ওয়াজে বলছেন যে তার স্ত্রী আসলে বিবি ফাতিমা এবং যেহেতু বিবি ফাতিমা তার 'ভেতরে' আছেন সেহেতু তার সাথে রাসুলের একটা 'যোগাযোগ' তৈরি হয়েছে এবং এই যোগাযোগের কারণেই তার মুরীদেরা তাকে রাসুল হিসাবে স্বপ্নে দেখেন। মজার ব্যাপার হোলো এই কথাগুলো যখন তিনি বলেন তখন তার ভক্তরা তাকে তীব্রভাবে সায় দেয়। ধার্মিকেরা যখন এই ভিডিও দেখেন তখন অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং সহজ প্রশ্নটি করতে ভুলে যান যে ভক্তদের কাছে এই গাঁজাখুরি কেন রিয়ালিটি বলে মনে হয়? কারণ দেওয়ানবাগীর ভক্তদের কাছে দেওয়ানবাগী একটা 'প্রোটেক্টেড ইভেন্ট'— আবেগ দিয়ে প্রোটেক্টেড— তাকে বাস্তবতার ধার ধারতে হয় না। আর যখন কোনো ইভেন্টকে আপনি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে ফেলতে

পারেন তখন এই ইভেন্ট 'ইতিহাস' থাকে না, একটা অর্গানিজমে পরিণত হয়— সেল্ফ-সার্ভিং অর্গানিজম।

আমি একবার একটা সামান্য পরীক্ষা করেছিলাম, ঘটনাটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমার এক তীব্র আওয়ামী সমর্থক বন্ধুকে একটা গাঁজাখুরি গল্প বলেছিলাম, দেওয়ানবাগীর গল্প থেকে খুব আলাদা না। আমি খুব সিরিয়াসলি তাকে বলা শুরু করলাম যে মাত্র নয় মাসে যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে এর আসল কারণ বঙ্গবন্ধু। তিনি যে লায়লপুর কারাগারে ছিলেন এটা পুরোপুরি সত্য না। প্রথমে বন্দী থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের বেশীরভাগ সময় তিনি মস্কোতে ছিলেন এবং মস্কোতে তিনি ইস্টার্ন ব্লকের হয়ে দর কষাকষি করছিলেন এমেরি কার সাথে। গল্পটা বিশ্বাস করানোর জন্য বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর নথিপত্রের উল্লেখ করলাম, বললাম যে— পুরোপুরি স্বীকার না করলেও প্রাভদা এবং নীয়র্ক টাইমস এর অমুক তারিখের এডিটোরিয়ালে এর উল্লেখ আছে।

আমার এই বন্ধুটি সম্ভবত বাসুদা এবং মেজবাহ আহমেদের পর্যায়ের শাহবাগী নন কিন্তু মজার সাথে লক্ষ্য করলাম যে একটিবারের জন্যেও জিজ্ঞেস করলেন না যে পাকিস্তান কেন বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেবে মস্কোতে যাওয়ার জন্য এবং মস্কো থেকে তিনি পাকিস্তানে ফেরতই বা আসলেন কী করে? মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু নিয়ে আপনি যাই বলবেন, যদি তার আবেগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় আমার বন্ধুটি তার শিশুমনে জায়গা দেবেন।

এটাকেই আমি বলেছি 'ফ্লুয়িড'; এবং ফ্লুয়িড বলেই পুরো ঘটনা আর কোনো ঐতিহাসিক ইভেন্ট থাকে না— হয়ে যায় একটা অর্গানিজম। এখানে একজন লাকীর প্রয়োজন হবে স্লোগান দেয়ার জন্য, একজন মাহবুব রশীদ দেবেন ফেইসবুক স্টেটাস, মেসবাহ আহমেদ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার ফাঁকে এসে আমাদের জানাবেন এক দেশে দুই আইন থাকার বিপদ এবং বাসুদা অনুরোধ করবেন সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য। ইতিহাস আর কোনো ঘটনা থাকে না, হয়ে যায় একটা প্রাণী— যে বদলে যায়, সরে যায়। যে অরক্ষিত হতে পারে এবং যার সম্ভ্রমহানিও হতে পারে।

শুধুমাত্র— আবারও বলছি— শুধুমাত্র 'চেতনা' ই পারে এই প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। কেন?

কারণ চেতনা হোলো এক গোছা বিশ্বাস যাকে আপনি যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে প্রায়োরিটি দেন। আপনি নিজেকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে এই বিশ্বাসগুলোই আপনার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানেই শেষ না— আপনার সামনের মানুষটিকেও চেতনা করতে হবে— কেননা আপনি তাকে বিচার করবেন আপনার নিজের চেতনা দিয়ে। ওইজা বোর্ডে যেমন আপনার অবচেতনের শক্তি আঙ্গুল নাড়িয়ে ডেকে আনে আত্মা, ঠিক তেমনি চেতনার সমস্বর, নিয়ন্ত্রণ করে ইতিহাস নামক প্রাণীটিকে। বর্তমানে বসে আপনি বদলে দেন অতীত।

এই যে আপনার ধর্মের মতো বিশ্বাস যাকে আমি ধর্মই বলি, শাহবাগীরা ভালোবেসে তার নাম দিয়েছে দেশপ্রেম।

২০১৪

ডিডেরো এফেক্ট

আমাদের বাসায় ঢুকলে প্রথমেই ফরমাল লাউঞ্জ এবং তার সাথে লাগোয়া ছোটো একটা ডাইনিং স্পেইস। বাড়ীতে যে দুজন সিদ্ধান্ত নেয়ার মানুষ, দুজনেরই পছন্দ মিড সেঞ্চুরী মডার্ন মিনিমালিস্ট ফার্নিচার। কিন্তু আলোচনার ব্যাপারে তারা মোটেও মিনিমালিস্ট না। প্রায় ছয় ঘন্টার বাকবিতণ্ডার পরে একমত হওয়া গেছে মিউটেড রঙের ফ্যাব্রিকের সোফায়। বসার জায়গা খুবই কম— যতোগুলো ফার্নিচার সেগুলো স্লীক এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রেট্রো ডিজাইনের।

এই জায়গাটা পার হোলে রান্নাঘর, তারপর ইনফরমাল লাউঞ্জ— মানে আগের দিনের বৈঠকখানা। এখানে আমরা টিভি দেখি, ঝগড়া করি, আমাদের মেয়ে বড় হয় আর বন্ধুরা আসলে পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান করে ফেলি। দুজনের পছন্দ মিলে গেলে আমরা দুটো হান্স ভাগনার পাপা বেয়ার চেয়ারে সম্মত হই মাত্র দশ মিনিটে। এই ঘরে আগে থেকেই এন্টারটেইনমেন্ট য়ুনিট ও কফি টেবেল ছিলো আমকাঠের; স্ক্যান্ডি ঘরানার— নতুন চেয়ারদুটোর সাথে ‘যায়’। কিন্তু এখানে একটা কাউচও ছিলো লেদারের যেটা ঠিক মিড সেঞ্চুরী মডার্ন না। পাপা বেয়ার চেয়ার কেনার আগে দুই বছর ধরে এই লেদার কাউচটা আমাদের সাথেই আছে, আমাকে অনেক দুপুরে ঘুমাতে দিয়েছে— একটুও খারাপ লাগে নি। কিন্তু চেয়ার দুটো যখন থেকে এই ঘরে জায়গা করে নিলো আমার মাথায় ঘুরছে কাউচটা বদলানো দরকার— এখানে এটা যায় না। খচখচ করছে কিছু। চেয়ার দুটো কেনার পর এক নতুন অস্বস্তিতে অভিষিক্ত হলাম আমি।

আমি আশ্চর্য হলাম এই জেনে যে ঠিক একই সমস্যায় পড়েছিলেন ১৮শ শতকের ফরাসি দার্শনিক ডেনিস ডিডেরো। গল্পটা মজার।

ডিডেরোর জন্ম ১৭১৩ সালে। তার সাথে কিছুটা তুলনা চলে আমাদের দেশে 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র মীজানুর রহমানের। ডিডেরো যতোটা না ফিলোসফার তার চাইতে অনেক বেশী কম্পাইলার অফ নলেজ। তিনি ফরাসি ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক ছিলেন প্রায় ৩০ বছর। যাদেরকে আজকাল আমরা এনলাইটেনমেন্ট ফিলোসোফার নামে দলভুক্ত করি, যেমন রুসো, ভলতেয়ার, হবস, এডাম স্মিথ, স্পিনোজা, কান্ট— এদের একজন ছিলেন ডিডেরো। প্রায় সারা জীবনই অর্থকষ্টে ভুগেছেন। তার যখন ৬০ বছর বয়স, রাশান সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দা গ্রেট, ডিডেরোর অর্থকষ্টের কথা জানতে পারেন। তিনি ডিডেরোর লাইব্রেরীটা কিনে ফেলেন এবং বার্ষিক ১০০০ লিভরা বেতনে সেই লাইব্রেরীর কেয়ার টেকার নিয়োগ করেন।

১০০০ লিভরা ১৭৭৩ সালে অনেক টাকা। হঠাৎ এতো টাকা একসাথে পেয়ে শখ করে ডিডেরো একটা লাল রঙের সিল্কের ড্রেসিং গাউন কিনে ফেললেন। কেনার পর দেখা গেলো যে এই লাল ড্রেসিং গাউন আনন্দের বদলে তার বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেন *"Regrets for my Old Dressing Gown, or A warning to those who have more taste than fortune"*— এই শিরোনামে। তিনি লিখছেন:

"My old robe was one with the other rags that surrounded me. A straw chair, a wooden table, a rug from Bergamo, a wood plank that held up a few books, a few smoky prints without frames, hung by its corners on that tapestry. Between these prints three or four suspended plasters formed, along with my old robe, the most harmonious indigence.

All is now discordant. No more coordination, no more unity, no more beauty."

তার আগের ছেড়া ময়লা রোব তার বাড়ীর অন্যান্য পুরনো জিনিসের সাথে একাকার হয়ে যেতো— তিনি লক্ষ্যই করতেন না। কিন্তু নতুন এই সিল্কের ড্রেসিং গাউন বাড়ীতে ঢোকার পর অন্য সব কিছু বেখাপ্পা লাগছে। তিনি একে একে নতুন পাওয়া টাকা দিয়ে ঘরের সব কিছু বদলাতে শুরু করলেন— সোফা, আয়না, পেইন্টিং। তিনি বলছেন যে মানুষটা তিনি আগের মতোনই আছেন— আগের মতোই গরীবদের সাহায্য করেন কিন্তু নতুন পাওয়া এই লাক্সারী তার পুরনো সাধাসিধা জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। আসল কথাটা প্রবন্ধের প্রথমেই ছেড়ে দিলেন:

"I was the absolute master of my old robe. I have become the slave of the new one."

১৯৮৮ সালে এনথ্রোপোলজিস্ট গ্র্যান্ট ম্যাকক্র্যাকেন প্রথম 'ডিডেরো এফেক্ট' নামটা দিলেন। তিনি দেখালেন যে একজন কনজিউমার প্রায়ই— আমার পাপা বেয়ার চেয়ারের মতো— নতুন একটা কিছু কেনার পর উচ্ছল হওয়ার বদলে যাতনার শিকার হন। ডিডেরো লাল রোবটা কেনার আগে জানতেই পারেন নি যে তার ঘরে এতো কিছু বদলানো প্রয়োজন।

কনজিউমারদের এই মানসিকতা সবচেয়ে ভালো বোঝে দোকানীরা। দেখবেন IKEA তে ডিসপ্লে করা হয় পুরা একটা বেডরুম কিংবা লাউঞ্জ— সব তাদের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। আপনি গিয়েছেন IKEA'র খাট কিনতে। মালম বেডটা আপনার পছন্দ হয়েছে (যে মানে য়োরোপের ১০% জনগণ এই বিছানার ওপরেই পৃথিবীতে আসার যাত্রা শুরু করেছে বলে অনুমান করা হয়— সাংঘাতিক ফলদায়ী খাট)। কিন্তু খাট কিনতে গিয়ে যেন আপনি নতুন দারিদ্র্য বোধ করতে পারেন সেজন্যেও রয়েছে সুব্যবস্থা। এই খাটটা যখন কিনেই ফেললাম, খাটের সাথে ম্যাচ করে ঐ যে কাবার্ডটা, কেমন তাকিয়ে আছে আমার দিকে— ওটাও যে কিনতেই হয়।

আমার মতো আপনারা সবাইই জীবনে কখনো না কখনো ডিডেরো এফেক্টের শিকার হয়েছেন নিশ্চয়ই। এর কারণটা কী?

ছোটো করে বলতে গেলে— মানুষ 'সৌন্দর্য' জিনিসটা আলাদা ভাবে বোঝে না— বোঝে ঐক্য ও সমন্বয়ের জোড়া-কারবারে। দলছুটকে সুন্দর

বলে মেনে নিতে আপনার মগজটা নারাজ। আপনার ব্রেইন যখন সুন্দর কিছু দেখে স্বীকার করে নেয় সুন্দর বলে, তার আগে সে বুঝে নিতে চায় এই 'সুন্দর' যেই কনটেক্সটে স্থিত, সেই কনটেক্সট সুন্দরকে অনুমোদন করে, না কি করে না। ডিডেরোর লাল রোব যে খুবই সুন্দর তিনি তা জানেন, কিন্তু তার মাথার একটা চাহিদা আছে যে তার পরিপার্শ্ব যেন এই রোবটার সৌন্দর্য অনুমোদন করে। সেই চাহিদা এতোটাই তুঙ্গস্পর্শী যে ডিডেরোকে বদলাতে হোলো তার পরিপার্শ্ব, কেননা তার মাথা বলছে খাপছাড়া সুন্দর আসলে সুন্দর না।

আমার মাথায় দৌড়ে ঢোকে আসল প্রশ্ন: ডিডেরো এফেক্ট তো বোঝা গেলো, বোঝা গেলো সুন্দরকে নির্দিষ্ট করার ব্যাকরণ। কিন্তু মানুষ অসুন্দরকে বোঝে কীভাবে? আসল চ্যালেঞ্জ তো ওখানেই। অসুন্দরকে নির্দিষ্ট করতেও কি একটা কন্টেক্সটের প্রয়োজন? ঐক্য ও সমন্বয়ের জোড়া-কারবার কি আগলিনেসকে বোঝার জন্যেও আবশ্যক। নাকি ঐক্য ও সমন্বয় না থাকাটাই অসুন্দর?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজ না। আগলিনেস, সৌন্দর্যের চাইতে অনেক বেশী ফ্যাসিনেটিং এবং চ্যালেঞ্জিং। আমি বিউটির চাইতে আগলিনেসকে বুঝতে বেশী আগ্রহী।

দেখতে আকর্ষণীয় পুরুষ ও নারীদের সাথে মানুষ, দুনিয়ার যাবতীয় পজিটিভ গুণাবলীকে যুক্ত করতে চায়। বিচিত্র এই খাসলত তাই না? দর্শকের তরফে এটাও এক ধরনের ডিডেরো এফেক্ট যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হোলো আকর্ষণীয় পুরুষ ও নারী, অনাকর্ষণীয় পুরুষ ও নারীদের চাইতে বেশী উপার্জন করে (এক হিসেবে গড়ে ৫ থেকে ১০% বেশী)। এমেরিকায় বহুবার দেখা গেছে কোনো কম্পানি যখন সুদর্শন সিইও নিয়োগ দেয় (সিইওরা খুবই লম্বা হয় কিন্তু; গড় উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি) এবং যখন এই সিইও প্রথম ক্যামেরার সামনে আসে– সেই কম্পানির স্টক বেড়ে যায়।

আকর্ষণীয় মানুষদের উপার্জন বেশী হওয়ার কিংবা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার এই প্রভাবকে সাধারণভাবে 'বিউটি প্রিমিয়াম' বলে। এর প্রধান কারণ হোলো আকর্ষণীয় মানুষদের সাথে ইনোসেন্স ও কম্পিটেন্সের

একটা কাল্পনিক যোগাযোগ মানুষ দেখতে পায়। পশ্চিমে এই কাল্পনিক যোগাযোগের বহু পুরনো সিলসিলা আছে। ১৮শ শতকে য়োরোপে খুবই প্রচলিত ধারণা ছিলো যে আপনার চেহারা আপনার মোরালিটির নির্দেশক। অর্থাৎ ভালো মানুষ হোলেই শুধু তার ফলাফল হিসেবে আপনার চেহারা সুন্দর হবে। য়োহান ক্যাসপার ল্যাভাটার রীতিমতো সচিত্র বই লিখে physiognomy নামের এক সিউডো-সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন। চার্লস ডারউইন জানাচ্ছেন যে তার পৃথিবী বদলে দেয়া সমুদ্র যাত্রার শুরুতে H.M.S. Beagle এর ক্যাপ্টেন তাকে জাহাজ থেকে বের করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। ল্যাভাটারের মুরীদ এই সারেঙের মত ছিলো চার্লস ডারউইন দেখতে কুৎসিত। যার নাক এতো লম্বা, এতো দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় তার দম থাকবে না।

হিটলারের ইহুদি নিধন প্রকল্পের পেছনেও ছিলো ১৮শ শতকে য়োরোপে ব্যাপক প্রচলিত 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ 'ইউজেনিক্স' (এটা যে ১৮শ শতকে সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদ ছিলো এই সত্যটা আজকাল আর উল্লেখ করা হয় না)— যেই মতবাদের মূলেও রয়েছে ওই একই সিউডো-সায়েন্স যে আপনার বাহ্যিক সৌন্দর্য হোলো অন্তর্গত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের সময়েও কি এই অপবিজ্ঞান কার্যকর আছে? অপবিজ্ঞান হিসেবে হয়তো নেই— কিন্তু হিউম্যান ইন্টার‍্যাকশানে এই ধারণাগুলো প্রবলভাবে কার্যকর আছে। সুজান বয়েলের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ২০০৯ সালে তিনি যখন ব্রিটেনস গট ট্যালেন্টে এসে রাতারাতি গ্লোবাল সেনসেশন হয়ে যান, দর্শক থেকে নিয়ে বিচারক ও মিডিয়া— কেউই ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না এই মহিলার গান গাওয়ার প্রতিভা। মহিলা যখন স্টেজে আসেন— প্রত্যেকের চেহারায় দেখতে পাবেন এই অবিশ্বাস। একটু বিস্ময় ও অনেকটুকু বিরক্তি— কেন এই মহিলা এখানে এসেছে? মহিলা বলছেন যে তিনি গান গেয়ে তার ভবিষ্যৎ একটু পরেই বদলে দেবেন। কেউ বিশ্বাস করছে না তার আত্মবিশ্বাস; চোখে মুখে একটাই অভিব্যক্তি— শি ডাজ নট বিলং হিয়ার।

এর কারণ একটাই: সুজান বয়েল দেখতে কুৎসিত (কলামিস্ট ন্যান্সি গিবস লিখছেন যে সুজান বয়েলের ভুরুদুটো যেন তিড়িং বিড়িং করা জীবন্ত ইঁদুর)। দেখতে কুৎসিত মানুষ যে গান অসাধারণ গাইতে পারেন

এই অতি স্বাভাবিক যোগাযোগটা চোখের সামনে থাকলেও তাদের মাথা মেনে নিতে পারছে না। সুজান বয়েলের জায়গায় যদি ক্লডিয়া কার্ডিনেল থাকতো— দর্শকরা কি তার কথাগুলো বিশ্বাস করতো? এবসোলিউটলি— ২৫ বছর বয়সের, লেপার্ড ফিল্মের ক্লডিয়া কার্ডিনেল যদি বলতো আমি গান গেয়ে এই স্টেজে এখন বৃষ্টি নামাবো— আমি সেটাও বিনা বাক্যে বিশ্বাস করে নিতাম।

খেয়াল করুন যে দুটো সুন্দরের মাঝে একটা যদি অলীক ও অবাস্তবও হয়— মানুষ সহজেই তার মাঝে যোগসূত্র আবিষ্কার করে। কিন্তু একটা সুন্দর ও একটা কুৎসিতের মাঝে পরিষ্কার যোগসূত্র থাকলেও মানুষ তা বিশ্বাস করতে চায় না।

আমার ধারণা, ডিডেরো এফেক্টের ঠিক উল্টো এফেক্ট হোলো সুন্দর ও কুৎসিতের মাঝে এই যে স্বাভাবিক সম্পর্ক— সেই সম্পর্কটাকে রিজেক্ট করা। এই এন্টি-ডিডেরো এফেক্টের কোনো নাম নেই কিন্তু কসম খোদার— ডিডেরো এফেক্টের চাইতে অনেক বেশী সুলভ এই নকশা। বুঝিয়ে বলি।

সমাজের আর দশজন লোককে যে কারণে আপনি 'মহামানব' বলে শনাক্ত করেন— ঠিক একই স্ট্যান্ডার্ড বলবৎ রাখলে ইমরান খান যে 'মহামানব' সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বিশ বছর ধরে তার হাতে তৈরি হাসপাতাল গরীব মানুষদের বিনামূল্যে ক্যান্সারের চিকিৎসা দিচ্ছে। কেবল একটা অর্জনই তার মহামানব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট যদিও আরো বেশ কিছু অর্জন তার ঝুলিতে আছে। যারা ইমরান খানকে অপছন্দ করে তারা কীভাবে এই অপছন্দ সম্পাদন করে— এটা ভাবা যেতে পারে।

কল্পনা করুন একটা বৃত্ত যার কেন্দ্রে রয়েছেন ইমরান খান আর পরিধিতে রয়েছে অনেকগুলো ছোটোবড় বল— নেতৃত্বের সফলতাকে ধরে নেই একটা ভলিবল। অন্তত টেনিস বলের সমান হবে তার গ্রীক দেবতাদের মতো ফিজিক (লেডী ডায়ানা ডেভিড ফ্রস্টকে বলছেন যে ইমরান খানের বোলিং রানআপ হচ্ছে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় তিনটা জিনিসের একটা— বাকী দুটো হোলো দই আর চার্লসের সাথে বিচ্ছেদ)। সবচেয়ে বড়, বাস্কেটবলটা নিঃসন্দেহে শওকত খানম হাসপাতাল, কিন্তু পিছিয়ে

পড়া পশতুনদের জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার নির্মিত ট্রেনিং কলেজটাও অন্তত ফুটবলের সমান। এই প্রত্যেকটা বলের সাথে সুতা লাগিয়ে জোড়া আছে— কল্পনা করুন কেন্দ্রের ইমরান খান। ডিডেরো তার ঘরে যা দেখতে চেয়েছিলেন, আপনি বলতে পারেন সেই 'য়ুনিটি অফ বিউটি' এই দৃশ্যকল্পে পুরোপুরি হাজির আছে। অনুমান করি তার সাফল্যগুলোকে সুন্দরের সাথে ইকুয়েট করার এই ফিকিরে আপনারা নারাজ হবেন না।

এখন যারা ইমরান খানকে অপছন্দ করে তারা কিন্তু প্রত্যেকটা সুতা কাটে না মনে মনে। আমি দেখেছি ৫ বছর আগে (মানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে) যারা ইমরান খানকে অপছন্দ করতো তাদের প্রায় প্রত্যেকের একটাই অভিযোগ: যে ইমরান প্লেবয় ও তিন বিয়ে করা। আমরা যদি তাদের অভিযোগ পুরোপুরি মেনেও নেই কথা থাকে যে তার যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, এর সাথে তিনি বিছানায় কী করেন আর কী করেন না— সেটা কি সত্যিই রিলেটেড? আপনি যদি হন IKEA'র সেই মালম বেড কিংবা তার ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চান— আপনার অভিযোগ যুক্তিযুক্ত— মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বাকীরা কেন তাকে খারিজ করছে? করছে কারণ তাদের চোখে এই একটি অপরাধই ইমরানের সব ধরনের সাফল্যকে নস্যাৎ করার জন্যে যথেষ্ট।

মনে রাখবেন আপনিও বেশীরভাগ মানুষকে অপছন্দ করেন মাত্র দুএকটা কারণে।

খেয়াল করুন ইমরানের এই যে দৃশ্যকল্প আমি আঁকলাম আর ডিডেরোর সেই ঘর— দুটোই কিন্তু একই রকমের। ডিডেরোর ঘরে অনেক অসুন্দর। তার মাঝে একটি সুন্দর জিনিস তাকে এতোটাই অস্বস্তিতে ফেলে যে তিনি সব অসুন্দরকে খারিজ করার বন্দোবস্ত করেন। অন্যদিকে ইমরানের দৃশ্যকল্পে অনেক সুন্দর— তার মাঝে একটি অসুন্দর আপনাকে এতোটাই অস্বস্তিতে ফেলে যে আপনি সব সুন্দরকে খারিজ করার বন্দোবস্ত করেন। পার্থক্যটা আসলে কোথায়?

আমার ধারণা দর্শকের ফোকাল পয়েন্টে। ডিডেরোর ফোকাল পয়েন্ট হোলো তার রোব, তিনি তার রোবের নিরিখে পুরো ঘরটাকে দেখছেন— যে জন্যে তার মাঝে অসুন্দরকে সুন্দরে উত্তীর্ণ করার আকুতি। তিনি যদি

তার ঘরটাকে তার রোবের নিরিখে না দেখে সোফার নিরিখে দেখতেন তাহলে কী হতো? আমার ধারণা, তার মাঝে বিউটির বদলে এপ্যাথির জন্ম হতো এবং খুব শীঘ্রি তিনি তার দামী লাল সিল্কের রোবকে ন্যাকড়া বানিয়ে ফেলতেন।

ঠিক একই কারণে, যেহেতু আপনি তার অন্যান্য সব সাফল্যকে বাদ দিয়ে 'প্রশ্নবিদ্ধ চরিত্রের' নিরিখে ইমরানের দৃশ্যকল্পটি দেখছেন— খুব সহজেই এই দৃশ্যকল্পের অন্যান্য সব সৌন্দর্য বাদ দিয়ে আপনার মধ্যে এপ্যাথির জন্ম হয়েছে। আপনি সহজেই ইমরানকে খারিজ করে ফেলতে পারেন। সুজান বয়েল যখন গান গাওয়া শুরু করেন নি— সবার ফোকাল পয়েন্ট ছিলো তার আগলিনেস। যে মুহূর্তে তিনি গান গাওয়া শুরু করলেন সবার দৃশ্যকল্পে সেকেন্ডের মধ্যে ফোকাল পয়েন্ট হয়ে গেলো তার বিউটি— গলার।

আমি বলছি, ফোকাল পয়েন্টের এই যে তারতম্য— সেই তারতম্যেই ঠিক করবে ডিডেরো এফেক্ট হবে না এন্টি-ডিডেরো এফেক্ট।

আগেই বলেছি— আগলিনেস, বিউটির চাইতে অনেক বেশী ফ্যাসিনেটিং। বিউটি প্রিমিয়ামের মতো 'আগলিনেস প্রিমিয়ামও' আছে। খুলে বলছি।

একবার এক সমীক্ষায় অসংখ্য মানুষের পোট্রেট দেয়া হোলো পরীক্ষার সাবজেক্টদের। বলা হোলো তারা যেন তাদের ইচ্ছামতোন এই মানুষদের চেহারা রেট করে। দেখা গেলো ভোটে যারা সবচেয়ে কুৎসিত বলে বিবেচিত, মানে সবচেয়ে নীচের ৩%; ওপরের ৫০%— যারা অল্প কুৎসিত কিংবা 'মোটামুটি' দেখতে তাদের চেয়ে বেশী উপার্জন করে। ঠিক একই ট্রেন্ড দেখা গেলো বেশ কয়েকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সমীক্ষায়। সাইকোলজিস্টরা নড়েচড়ে বসলেন। এটা তো হওয়ার কথা না। আগলিনেসের কারণে আপনার উপার্জন যদি আকর্ষণীয় মানুষের চেয়ে কম হয়— সেই যুক্তিতে সবচেয়ে কুৎসিত মানুষদের সবচেয়ে কম উপার্জন করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। কারণটা কী?

দেখা গেলো যে আগলিনেসের কারণে একজনের ক্রেডিবিলিটি কমে না কিন্তু বিউটির জন্যে ক্রেডিবিলিটি কমতেও পারে। সহজ ভাবে বলতে গেলে কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসর যদি দেখতে

কুৎসিত হয়— আপনি বরং সেটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবেন কিন্তু তিনি যদি হোন কেইট ব্ল্যানচেটের মতো সুন্দরী— আপনি নড়েচড়ে বসবেন— ঠিক জায়গায় আসলাম তো? ব্র্যাড পিট যে সত্যিই খুব উঁচু মাপের অভিনেতা সেটা অনেকেই স্বীকার করতে চান না কারণ 'বিউটি', অভিনেতা হিসেবে তার ক্রেডিবিলিটি আসলে কমিয়ে দিয়েছে।

আগলিনেস এক অর্থে লিবারেটিং— ট্রুলি লিবারেটিং। আপনি যদি জানতেন যে আয়নার সামনে দাঁড়ালে জনি লিভারকে দেখা যায় আপনি কি আপনার চেহারার দিকে মনোযোগ দিতেন না অভিনয়ের দিকে?

কিন্তু যে দর্শক জনি লিভারকে দেখছে তার জন্যেও কি আগলিনেস লিবারেটিং? এটা খুবই জটিল প্রশ্ন যার কোনো সহজ উত্তর নেই।

আগলিনেস জিনিসটা কী এর কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা হয় না। মধ্যযুগে য়োরোপে monstrous, grotesque, deformed, freak, degenerate, handicapped— এই শব্দনির্দেশক মানে এক কথায় ভীতি উদ্রেককারীকে কুৎসিত বলা হতো। সমস্যা হোলো, ভীতি উদ্রেক না করলেও আমরা অনেক কিছুকেই আগলি বলি।

ইংলিশ ঔপন্যাসিক ন্যান্সি মিটফোর্ড একটা নতুন টার্ম নিয়ে এলেন ষাটের দশকে: jolie laide— মানে একই সাথে আগলি ও এট্রাকটিভ। উদাহরণ চান? এঞ্জেলিকা হিউস্টন, সান্দ্রা বার্নহার্ড, টিল্ডা সুইনটন, স্মিতা পাতিল, এড্রিয়ান ব্রোডি, মল্লিকা শেরাওয়াত, অজয় দেবঘন, রবার্ট প্যাটিনসন, এডাম ড্রাইভার— আরো লাগবে? এরা আগলি হোলেও ভীতির সঞ্চার করছেন না বরং কামনার উদ্রেক করছেন। উল্টোটাও আছে— মানে আনআগলি ও আনএট্রাকটিভ— যেমন বাংলাদেশের রোকেয়া প্রাচী। অনেক মেয়ে জানিয়েছে যে খুবই সুন্দর কোনো ছেলে যদি পশুর ওপর অত্যাচার করে তাকে তাদের আগলি মনে হয়।

আগলিনেস আপনার মাঝে ঠিক কোন ইমোশান ট্রিগার করবে এটাও কিন্তু ছকে ফেলার বিষয় না। আপনারা জানেন যে আগলিনেস থেকে দয়া ও করুণারও সঞ্চার হয়। ডেভিড লিঞ্চের 'দা এলিফ্যান্ট ম্যান' যারা দেখেছেন তারা হয়তো আমার সাথে একমত হবেন। আগলিনেস কৌতূহল সৃষ্টি করে, আগলিনেস হাস্যরস সৃষ্টি করে, এমন কি আগলিনেস

জনপ্রিয়তাও সৃষ্টি করে। ১৫১৩ সালে ফ্লেমিশ আর্টিস্ট কুইন্টন ম্যাসিস এক বিকৃত চেহারার মহিলার পোট্রেট পেইন্ট করেছিলেন— বলতে গেলে কুইন্টন ম্যাসিসের এই একটি পেইন্টিংই মানুষ পাঁচশ বছর পর মনে রেখেছে। পোট্রেটটি লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ডা ভিঞ্চিও এই মহিলাকে স্কেচ করেছেন। তিনি বীভৎস ও কুৎসিত চেহারার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন কি না বলার উপায় নেই কিন্তু প্রচুর নিখুঁত স্কেচ করেছেন— বীভৎস চেহারার— হয়তো মজা করার জন্য।

বুঝতেই পারছেন আপনার মাথা, কোন বিষয়কে 'আগলি' হিসেবে রেজিস্টার করবে এবং করলে আপনার মাথায় ঠিক কোন অনুভূতির সঞ্চার হবে— এক্ষেত্রে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কাজেই দর্শকের জন্য আগলিনেস লিবারেটিং কি না বলা মুশকিল।

তবে

বাঙালি কীভাবে 'আগলিনেস' কে দেখে এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলে। বহু বছর আগে আমার ইচ্ছা ছিলো একটা থীসিস লেখার। পৌরুষ, বিউটি ও আগলিনেস এই বিষয় তিনটিকে বাঙালি কীভাবে বোঝে— ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। আমি আশ্চর্য হয়েছি এই দেখে যে বাঙালি আগলিনেস নিয়ে প্রায় কিছুই লেখে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অসুন্দরকে নিয়ে বাঙালির প্রায় কোনোই আগ্রহ নেই। উমবার্তো একোর একটা মাস্টারপীস হোলো On Ugliness। তিনি শত শত ছবি দেখিয়ে বর্ণনা করছেন য়োরোপীয়ানরা মধ্যযুগে আগলিনেসকে কীভাবে বুঝেছে, এখন কীভাবে বোঝে। ১৮৮০ থেকে নিয়ে ১৯৮০— মোটামুটি এই একশ বছরে আমি বাঙালির করা এমন একটা কোনো পেইন্টিং বা স্কাল্পচার দেখি নি যার মুখ্য উদ্দেশ্য হোলো আগলিনেসকে প্রতিভাত করা। আপনি বলতে পারেন যে মৃণাল হকের বা বাংলাদেশের প্রায় যেকোনো পাবলিক স্কাল্পচার ইনস্টলেশন চূড়ান্ত রকমের আগলি— দেখলে হয় হাসি পায় নয়তো গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা বাংলাদেশী ভাস্করদের প্রতিভাহীনতার স্বাক্ষর, তাদের উদ্দেশ্য আগলিনেস ছিলো না।

বহু বছর আগে আমি একবার রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পড়েছিলাম শুধুমাত্র একটা বিষয় মাথায় রেখে। তিনি মোট কতো শব্দ ব্যবহার করছেন ম্যান-মেইড অবজেক্টকে বর্ণনা করার জন্যে এবং কতোগুলো শব্দ ব্যবহার করছেন 'আগলিনেস'কে বর্ণনা করার জন্য। যেমন তিনি লিখছেন, *"উচুঁ খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তীর্যকভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে"*— এখানে পুরো প্রথম বাক্যটাকে আমি ধরেছি ম্যান-মেইড অবজেক্টের বর্ণনা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথকে বাছার কারণ তিনি তার সময়ের অন্য যেকোনো গদ্য লেখকের চাইতে বেশী 'উপস্থিত' বর্ণনাকারী ছিলেন বলে আমার মত। এন্ড য়েট, যতোদূর মনে পড়ে পুরো শেষের কবিতায় ম্যান-মেইড অবজেক্টের বর্ণনা আছে টেনে-টুনে পাঁচ শর কম শব্দে— এবং আমার বিচারে আগলিনেসের কোনো উল্লেখই নাই এই উপন্যাসে (আপনার বিচার ও আগলিনেসের ব্যাপারে আমার উপসংহার এক হবে না জেনেই উল্লেখ করলাম)।

আপনি বলতে পারেন এটা প্রেফারেন্সের মামলা— তিনি তার সময়ে গদ্য লেখার যে চল সে অনুযায়ী হয়তো এ ধরনের বর্ণনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নাই। হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে অসুন্দরে ঘায়েল হওয়ার ক্ষমতাটাই তার ছিলো না— তাই তার চোখে পড়ে নি আগলিনেস।

নিরন্তর অসুন্দরের মধ্যে থেকে অসুন্দর নিয়ে আলোচনায় বাঙালির এই অনীহা কেন?

বড়ই কঠিন প্রশ্ন। মনে পড়ছে ফোকাল পয়েন্টের কথা বলছিলাম? বাঙালি তার পরিপার্শ্বকে দেখে ডিডেরোর লাল গাউন না, সম্ভবত তার সোফার নিরিখে। তাই তার মাঝে জন্ম নেয় এপ্যাথি।

জীবনে বহু মানুষকে জিজ্ঞেস করেছি— তারা যে জিনিসটাকে সুন্দর বলছে— কেন বলছে? মুখে কোনো উত্তর নেই। সে বোঝাতে পারে না কেন এই জিনিসটা তার কাছে সুন্দর। কোনোদিন এমন একজন বাঙালি পাই নি যিনি বলছেন এই জিনিসটা সুন্দর— সিমেট্রির কারণে (যেমন ধরুন সিফোনেলির একটা সুট— ট্রাউজার, সুট, লেপেল, পকেট—

প্রতিটি কার্ভে আপনি সিমেট্রি দেখতে পাবেন)। আমি আমার জীবনে কেবল পাঁচ-ছয়টা বাঙালি ঘরে গিয়েছি যেখানে বাসার ফর্নিচারগুলো অন্যান্য অবজেক্টের সাথে নিখুঁতভাবে কো-অর্ডিনেট করা। কোনো বাঙালি যেকোনো অবজেক্টের বর্ণনা করতে গিয়ে তার সার্ফেসের বর্ণনা করছে— সত্যি বলছি— আমি জীবনেও শুনি নি। আমি অনেক ফ্যাশন ডিজাইনার ও টেইলরের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি— শুধুমাত্র ভুল টেক্সচার/ সার্ফেসের জন্য একটা জামা যে বিশ্রী লাগতে পারে এই চিন্তাটার সাথেই তারা পরিচিত না (তারা শুধুমাত্র কাপড়ের রং ও টাইপ— মানে সেটা সিল্ক না সুতি না য়ুল— এতোটুকু বিবেচনা করে)।

আপনারাও পরীক্ষা করতে পারেন। কাউকে সুন্দর কোনো একটা অবজেক্ট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে তার মতে এই জিনিসটা সুন্দর বা অসুন্দর কেন। ঘুরে ফিরে এই শব্দগুলো ছাড়া সে বর্ণনা করতেই পারবে না: ডিজাইন, গর্জেস, সিম্পল, নিখুঁত, রংটার নাম, অসম্ভব, ফাটাফাটি ও স্মার্ট। মিনিমালিজমকে বাংলায় তর্জমা করতেও তার তিনটা শব্দ লাগে: 'সিম্পলের মধ্যে গরজিয়াস'।

আমি বোধ করি, অসুন্দরকে (এবং সুন্দরকেও) বোঝার যে ভোকাবুলারী— সেটা বাঙালির নেই। সেহেতু অসুন্দরকে দেখে বিবমিষা বা সুন্দরকে দেখে শিহরণ— কোনোটাই তার মাঝে জাগে না সেভাবে। তার মাথায় সুন্দরের প্রসঙ্গে কেবল একটাই ভাবনা: কীভাবে সেটা আয়ত্ত করা যায় আর কীভাবে অসুন্দরকে এড়ানো যায়।

এমন নয় যে আমাদের চারপাশে সুন্দর কিছু নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা আপনার ফোকাল পয়েন্ট হবে কি না সেটা সম্ভবত সুন্দর বা অসুন্দরের সাথে সম্পর্কিত না; সম্পর্কিত আপনার অভ্যাসের সাথে। ডেনিস ডিডেরো যে তার লাল রোবে ঘায়েল হোলেন— এটাই কিন্তু একমাত্র পরিণতি ছিলো না। ডিডেরো যে অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন— সেটা কি একটা ঘটনা ছিলো, নাকি ছিলো তার প্রতিভা— কী আশ্চর্য— এই প্রশ্ন কেউ কোনোদিন করে নি।

২০১৯

'উইল ডু' জেনারেশান

ভূমিকা

পশ্চিমের সোশাল এলিটদের একটি গ্রুপকে '৫০ এর দশকে 'জেট সেট' বলা শুরু হয়। এদের দেখা মিলতো য়োরোপের সব বড় এয়ারপোর্টে, উড়ালের অপেক্ষায়। তখনকার এয়ার ফেয়ার সাধারণদের জন্য অকল্পনীয় রকমের ব্যয়সাধ্য ছিলো বলে জেট প্লেনে ভ্রমণ কেবল অতিধনীদের জন্যই বরাদ্দ ছিলো (লন্ডন- নীয়র্ক এখন যেখানে ৬০০ ডলারে ঘুরে আসা যায়, '৫০ এর দশকে আজকের হিসেবে ৫ থেকে ৬ হাজার ডলার খরচ হতো)। অঞ্জন দত্ত তার 'মালা' গানটি যে গানের অবলম্বনে/অনুকরণে রচনা করেছেন, পিটার সার্স্টেটের সেই 'Where do you go to my lovely' গানটিতে জেট সেটদের তীক্ষ্ণধী বিবরণ আছে। সে বর্ণনার সাথে বাংলাদেশের অতিধনীদের মিলিয়ে দেখার ইচ্ছা থেকেই এ লেখার শুরু। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে জেট সেটদের সমার্থক কোনো শ্রেণী বাংলাদেশে আছে কি না, থাকলে তাদের কী নামে ডাকা যায়, কতো সম্পদ কিংবা ঠিক কী ধরনের আচরণ এদের বিশেষায়িত করে– এ ধরনের বহু প্রশ্ন নিয়ে আমি বাংলাদেশের কিছু অতিধনীদের সাথে কথা বলা শুরু করি, যাদের বয়স ২৫ থেকে চল্লিশের মধ্যে। নিজেরা অতিধনী না বাবা অতিধনী এই পার্থক্যে আমি যাই নি যেহেতু সামগ্রিকতার খোঁজ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর না, আমি কেবল নির্মোহভাবে এদের কয়েকজনকে দেখতে চেয়েছি। প্রথমে পরিকল্পনা ছিলো যাদের সাথে কথা বলছি তাদের ছবিও জুড়ে দেবো, যেহেতু এই মানুষগুলোকে বোঝার জন্য তাদের চেহারা দেখা খুব জরুরী। সমস্যা হোলো, লেখালেখির কথা শুনলে হয় তারা নিজেদের গুটিয়ে নেন, নয়তো বানিয়ে বলা শুরু করেন।

একজন বাদে (যিনি নিজেকে অতিধনী মনে করেন না) প্রত্যেকেরই শর্ত, পরিচয় দেয়া চলবে না। তাই আসল পরিচয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে দেয়া হোলো।

রাইজ অফ দি ফকিন্নীজ

অপ্টামাস প্রাইমদের উত্তরা ৪ নং সেক্টরে ৫ কাঠা জমির ওপর কিউবিস্ট আর্কিটেকচারের মডার্ন ডুপ্লেক্সটি যখন '৮৯ সালে বানানো শেষ হয় তখন খরচ হয়েছিলো এক কোটির সামান্য বেশী। সেদিনের ক্লাস সিক্সে পড়া কিশোরটি এখন পুরো দস্তুর ব্যবসায়ী। বিশাল পারিবারিক ব্যবসার একটি অংশ (চামড়াজাত জুতা তৈরি) পরিচালনা করেন। কিছুদিন আগে তিনি প্রায় সোয়া কোটি টাকা খরচ করে ২০১১ এডিশানের বিএমডাব্লিউ 5 সিরিজের কাস্টোম-মেইড একটি গাড়ী কিনেছেন। তার কিছুদিন আগে কিনেছেন মার্সিডিজ এস ক্লাস। বিএমডাব্লিউটি তিনি নিজে ড্রাইভ করেন ছুটি-ছাটায় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানে যেতে হোলে (যেমন ফাইন ডাইনিং রেস্টারান্ট কিংবা মন্ত্রিবাড়ী)। যে শহরে ৮০ কিলোমিটারের বেশী গতিতে কয়েক সেকেন্ডের বেশী গাড়ী চালানো সম্ভব না সেখানে কোটি টাকা দিয়ে বিএমডাব্লিউ কিনে কী লাভ– এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, *"সারাদিন ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকি, এটাই তো একমাত্র শখ।"*

অপ্টামাস প্রাইমদের ব্যবসায়িক উত্থান ট্যানারি থেকে। শুরুতে বাবা আর চাচা থাকলেও দুই পরিবারের চার পুত্র সন্তান যোগ দেয়ায় এখন ব্যবসার বিস্তৃতি বেড়েছে বহুগুণ (কন্যা সন্তানরা ব্যবসায় নেই, তারা প্রবাসী)। প্রথম দিকে ব্যবসার ঝোঁকটা ছিলো বিদেশের দিকে। এখন দেশের বাজারই বিশাল। বেড়েছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। তিন বছর আগে আমি কল্পনাও করিনি যে বাংলাদেশী ব্র্যান্ডের স্যান্ডেল দুই হাজার টাকায় বিক্রি হবে; অপ্টামাস প্রাইমরা সেটাও করে দেখাচ্ছে। এমন অর্থনৈতিক রূপান্তর শিল্পোদ্যোক্তাদের উপভোগ না করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। তার মতে এখানে ভদ্রলোকদের জন্য আর কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই। শুরু হয়েছিলো ওয়ান-ইলেভেনে। খালেদা জিয়া-শেখ হাসিনা জেলে গেলে ফকিন্নীরা বাকবাকুম হয়ে ভাবতে শুরু করে যে আমাদের সাথে তাদের তো আর কোনোই পার্থক্য নেই। যে কারণে ফকিন্নীরা কোনো সমস্যা হোলেই

এখন গাড়ী ভাঙে (এ কথাটার ইঙ্গিত ছিলো এই আলাপের একদিন আগে সংগঠিত অটোরিকশা চালকদের সংঘবদ্ধ বিক্ষোভে সাধারণ নাগরিকদের গাড়ী ভাঙার প্রতি), ঢিল ছোড়ে বাড়ীতে। ভবিষ্যতে ফকিন্নীদের বাড় আরও বাড়বে বলে আশংকা অপ্টামাস প্রাইমের; তখন তারা রাস্তাঘাটে ভদ্রলোকদের থাপ্পড় মারবে, তর্ক করবে।

ড্রীম মেশিনস— মেন'স টয়জ

অপ্টামাস প্রাইমের সাথে এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছিলো অটোবট বাম্বলবী। আশির দশকে শোনা যেতো যে তার চাচা বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। ওবিস হওয়ার কারণে স্কুলে সে জনপ্রিয় ছিলো না মোটেও। ক্লাসের বাকী ছেলেদের মতে সেজন্যেই তার জায়গা হয়েছিলো তিন উইয়ার্ডোর ছোট্ট এক দলে, যারা টিফিন পিরিয়ডে এক সাথে হেঁটে বেড়াতো, আগের দিন প্ল্যান করে টিফিন নিয়ে আসতো, ফ্লাস্কে থাকতো ট্যাং। ক্লাসের বুলীরা বাম্বলবীকে খেপিয়ে বিনোদিত হতো, আর মেয়েরা নিরাপদ দূরত্বে এড়িয়ে যেতো সম্ভবত তার দৈহিক বিশালত্বের কারণে। দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করে ক্লাস এইট-নাইনে ওঠার পর। অবহেলার বাম্বলবী হয়ে ওঠে ঈর্ষার পাত্র। একসময় ওদের ঐশ্বর্য ছিলো শুধুই একটা তথ্য, বড়জোর সাধারণ আলাপের বিষয়; কিন্তু এখন সেটা চেখে দেখার মতোন বাস্তবতা— বিস্ময় আর ঈর্ষার খোরাক। বাম্বলবী চুল কাটতে সিঙ্গাপুর যায়, কিংবা যে সব মেয়েদের ওর সাথে এক গাড়ীতে দেখা যায় তারা সব বেহেস্তেরই প্রাণী (কিন্তু চরিত্র ভালো না), এসাইনমেন্ট শেষে ফিরে যাবে।

কলেজ-য়ুনিভার্সিটির ফ্যান্টাসির দিনগুলো শেষে এখন বাম্বলবীর ইমেজ কী? আশ্চর্যজনক ভাবে অপ্টামাস প্রাইমের মতোন এখানেও একটা বড় ফ্যাক্টর হোলো গাড়ী। নায়োমি ক্লাইন তার 'নো লোগো' তে দেখিয়েছেন '৯০ এর দশকে আমেরিকার বড় ব্র্যান্ডগুলো কীভাবে মানুষের আইডেন্টিটির অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, কতোটুকু অন্তঃসারশূন্য হোলে কেউ নাইকির লোগোর উল্কি আঁকায় বাহুতে। আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের উইল ডু জেনারেশানের কাছে গাড়ী এমনই একটা আইডেন্টিটি যা ছাড়া তারা নিজেদের সম্পূর্ণ মনে করতে পারে না, যেজন্য তারা ফেইসবুকের প্রোফাইলে নিজের না, তাদের গাড়ীর পোট্রেট আপলোড করে। ছোটোবেলায় স্কুলে আমাদের ক্লাসে অনেকগুলো ইমরান ছিলো যার মধ্যে একজনকে আলাদা করার সুবিধার্থে বলা হতো কুত্তা

ইমরান; কেননা সে কুকুর পুষতো। যে ছেলেগুলো ছোটোবেলায় ওকে কুত্তা ইমরান বলতো এখন তারা বিশেষিত করে ইভো-এইট চালানো ইমরান হিসেবে। বাম্বলবী তার পরিমণ্ডলে পরিচিত ঢাকার একমাত্র (?) ফিফথ জেনারেশান শেভি ক্যামেরোর মালিক হিসেবে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তাহলে বাম্বলবী একদিন হয়তো গাড়ীর কালেকশানে পাল্লা দেবে জে লেনোর সাথে। শোনা মতে তার গারাজে আরো আছে স্কাইলাইন জিটিআর, দুটো পোর্শ, পাঁচটি বিএমডাব্লিউ এবং অগণিত ছানাপোনা।

এই ব্যাপারটা আমাকে খুব আশ্চর্য করে। স্বাভাবিক চিন্তায় আপনি আশা করবেন যে অনেক টাকা থাকলে কেউ হয়তো তিন চার কোটি টাকা দিয়ে গাড়ী না কিনে ছোটো-খাটো একটা পিকাসো কিনবে (বিনিয়োগ হিসাবেও যা অতুলনীয়), ওয়াইন সেলারে ভিন্টেজ ১৯৯৭ ডোমেন ডে লা রোমেনী কোটীর পসার সাজিয়ে সমঝদারের ভান করবে, কিংবা স্লাভোয় জিজেক, নাসিম নিকোলাস তালেবকে দাওয়াত দিয়ে দেশে এনে পাবলিক ফোরামে 'মাই ডীয়ার ফ্রেন্ড নাসিম' কে পরিচয় করিয়ে দেবে (রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতেন আর কি)। বেশী টাকা হওয়ার প্রথম উপসর্গ হোলো পরিচয় সঙ্কট যার প্রতিফলন দেখা যাবে জাতে ওঠার চেষ্টায় (এই কসরতটিকে শুধু সমালোচনা করলে আপনি ভুল করবেন)।

পৃথিবীতে এতো কিছু থাকতে সবাই একযোগে একটিমাত্র শখের অনুবর্তী কেন হবে— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সম্ভবত ছোটোবেলায় টেলিভিশনের পর্দায় যে রঙিন স্বপ্নলোকের সন্ধান তারা পেয়েছিলো, দেশে বসে সে স্বপ্নলোককে ছুঁয়ে দেখবার কেবল একটিই পথ তারা বের করতে পেরেছে। অটোবট আয়োনহাইড এ প্রসঙ্গে তার দার্শনিক মতামত দিয়েছেন অকপট প্রবচনে: *"ওয়েস্টে পোলাপানরা পুরুষ হওয়ার প্রমাণ দিতে আগের দিনে স্কাউটিং এ গোপনে জমায়েত হয়ে জিপার খুলে স্কেল নিয়ে কন্টেস্ট করতো কারটা লম্বা, আর আমাদের দেশে পোলাপানরা শুক্রবার রাতে বাপের টাকায় কেনা গাড়ী বাইর করে দেখায় Carটা লম্বা।"*

মানি কান্ট বাই এভ্রিথিং, দ্যাটস ওয়াই ওয়ান নীডস পাওয়ার

অটোবট আয়োনহাইডদের পারিবারিক ব্যবসা প্রিন্টিং। উইল ডু জেনারেশানের ব্যাপারে তার কাছে পাওয়া যাবে বিস্তর তথ্য, কিন্তু নিজে

এখনও সেই ক্লাসকে প্রতিনিধিত্ব করেন না বলেই তার দাবী। কেন? তার মতে এই ক্লাসটা খুবই এক্সক্লুসিভ। আপনার ব্যবসা যদি একশ' কোটি টাকার উপরে হয় তাহলেই কেবল এই ক্লাবে ঢোকা যাবে। মনে রাখবেন একশ কোটি টাকার ব্যবসা আর একশ কোটি টাকার জমি-জমা এক জিনিস না। অপ্টামাস প্রাইমদের গুলশানে পৌনে দুই বিঘা জমি কেনার জন্য তিনশ কোটি শাদা টাকা নিয়ে পার্টি রেডি আছে (জানিয়ে রাখা ভালো যে সিডনীর অপেরা হাউজের ঠিক পাশের পৌনে দুই বিঘা জমির দামও ৪০ মিলিয়ন ডলার না)। জমির মালিক শত-কোটিপতি ঢাকা শহরে নাকি অনেকেই আছেন। কিন্তু শতকোটি টাকার ব্যবসা করতে হোলে ক্ষমতাকে সংহত করতে হবে। তা সেই ক্ষমতাটি কেমন বস্তু? একটা উদাহরণ দেয়া যাক। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এক আত্মীয়র (যিনি মন্ত্রীসভায়ও আছেন) বোনের সম্পত্তি দখল করে রেখেছিলো অন্য কোনো তালেবর (উল্টোটাও হতে পারে, নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই আমার জন্য) অসীম ক্ষমতাধর ভাইটি যেখানে বোনের জমি উদ্ধার করতে পারেন নি, সেখানে অপ্টামাস প্রাইমের অরাজনৈতিক ব্যবসায়ী চাচা কলকাঠি নাড়িয়ে জমির মিটমাট করেছেন মাত্র কয়েক সপ্তায়।

আয়োনহাইড ক্ষমতা আর ক্ষমতার অপব্যবহারকে মিলিয়ে দেখতে ভালোবাসেন। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম উইল ডু জেনারেশানকে আলাদা করা যাবে কোন একটি লক্ষণে? তার উত্তর ছিলো 'এরোগ্যান্স'। এদের বাবারা এখনও অনেক 'ডাউন টু আর্থ' কিন্তু এরা যা ইচ্ছা তাই করে— লিট্রেলি। তার এক বন্ধু এয়ারপোর্ট রোডে আরেক গাড়ীর সাথে রেইস করতে গিয়ে একটু চাপিয়েছিলো। সে গাড়ীতে ছিলো পশুন্ধরা গ্রুপের মালিক পরিবারের একজন সদস্য। গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে শটগান বের করে তার দিকে তাক করে থ্রেট করা হয়। আয়োনহাইডের সুচিন্তিত পরামর্শ: ঢাকা শহরে গাড়ী চালাতে হবে আদবের সাথে।

বাংলাদেশে ক্ষমতার কেবল দুইটি প্রকাশ চোখে পড়ে। প্রথমটি অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া অর্থাৎ যিনি যতো বড় অনিয়ম করতে পারেন তিনি ততো বেশী ক্ষমতাবান এবং দ্বিতীয় প্রকাশটি একেবারেই সিম্বলিক কিন্তু ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। অমুকের সাথে ম্যাডাম ও বুবু চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন না মাটির দিকে তাকিয়ে, তমুককে প্রেসিডেন্ট

আগে সালাম দিলেন কিংবা হবিগঞ্জ গেলে বুবু তার পুকুরের শোল মাছ না খেয়ে ফেরেন না— এ জাতীয় (এই ক্ষমতাকে উড়িয়ে দেবেন না, মোক্ষম জায়গায় এর অনেক দাম)। উইল ডু জেনারেশান এখনও কেবল ক্ষমতার প্রথম প্রকাশটি নিয়েই চিন্তিত কিন্তু তাদের পিতারা অকপট উভগামী। তবু ভারতের অতিধনীদের সাথে এক্ষেত্রে আমাদের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

সন্দেহ নেই যে অর্থের দিক থেকে ভারতের সাথে আমাদের অতিধনীদের তুলনা করা বোকামি কিন্তু সময়ের বিচারে দুটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে মোটামুটি একই সাথে। এই সময়ে ভারতীয় অতিধনীরা ক্ষমতাকে সংহত করেছে অবিশ্বাস্য দক্ষতায়, যেটা বাংলাদেশীরা পেরে ওঠে নি। ভারতীয় অতিধনীরা পুরোপুরি আন্টাচেবল। কংগ্রেস, বিজেপি দুটো দলকেই তারা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। রাজনীতিবিদরাও বোঝেন যে মারামারির চেয়ে গলাগলি ভালো। সে তুলনায় বাংলাদেশের অতিধনীরা এখনও আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে বিভক্ত। যে কারণে হাশেম খান, আহমেদ আকবর সোবহান, আব্দুল আউয়াল মিন্টুকে কোর্ট-কাচারি করতে হয়, আগামীতে হয়তো খান ব্রাদার্সকে করতে হবে। আমাদের দেশে উপর থেকে নীচে সবাই ক্ষমতার উগ্র প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বিধায় এই বিচিত্র চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সাধারণ মানুষের পক্ষেই যায় বলে আমার বিশ্বাস। তবে হাসিনা-খালেদা উত্তর বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন: আলাদা হয়ে কামড়া-কামড়ির অপোর্চিউনিটি কস্ট অনেক বেশী। ইতিহাস বলে, দস্যুতা সংহতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দিস ইজ ওয়ান বিগ ফান প্লেস

আমার ধারণা ছিলো পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে বিলিওনিয়ারদের (স্থানীয় মুদ্রায়, ডলারে না) এতো বাজে লাইফ স্টাইল নেই। যতো টাকাই থাকুক, ট্র্যাফিক জ্যামে দিনে দুই-তিন ঘণ্টা যাবেই— ঘুমানোর সময়টা ছাড়া দিনে বিশ মিনিটও একা থাকা সম্ভব না। বিলিওনিয়ার হওয়ার কারণে আপনার মধ্যে যে অতি-পৌরুষ জেগে উঠবে তাতে এমন মনে হওয়াটা অসম্ভব না যে তার প্রয়োগ শুধুমাত্র বাংলাদেশী নারীকুলের মধ্যে সীমিত রাখাটা অন্য জাতির মেয়েদের জন্য অবিচার। তাছাড়া যে

জিনিসটির সাথে তাদের নিবিড় ও অক্ষয় প্রেম, সেই মেনস টয়গুলোর উপযোগী রাস্তাও তো দেশে নেই। সে আন্দাজে প্রায় প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করেছি তারা বাংলাদেশে আছেন কেন? যে ছেলেটা কোনো কষ্ট না করেই কয়েক শ কোটি টাকার উত্তরাধিকার ভোগ করবে, পশ্চিমের নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করতে পারবে অনায়াসে, তার জন্য বিদেশে থাকাটাই কি স্বাভাবিক না?

অটোবট জ্যাজ দার্শনিক গোছের মানুষ। আমাকে বললেন যে, *"য়ু আর ল্যাকিং পার্স্পেক্টিভ। টাকা, অর্থনৈতিক লেনদেনের মাপকাঠি ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ আপনার কাছে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। পঞ্চাশ-একশ কোটির পরে যা ইচ্ছা তার প্রায় সবই আপনার কেনা হয়ে যায়। কিন্তু বয়স তো সবে পঁয়ত্রিশ। এরপরে ইট বিকামস এ হোল নিউ বল গেইম। কীভাবে আপনার নেটওয়ার্ক বাড়াবেন? কীভাবে আপনার পাওয়ার কনসলিডেট করবেন? পাওয়ার মানে কিন্তু এই না যে আপনার আসলে কী আছে, পাওয়ার সেটাই যেটা অন্যেরা মনে করে আপনার আছে। সবসময় যে আপনি লাভবান হবেন তা না কিন্তু য়ু ক্যান মেইক ফ্রেন্ডস অ্যালঙ দ্যা ওয়ে। এটাই কিন্তু সারা পৃথিবীতে হয় এবং এটাই সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট। আপনি কাদের চেনেন। কিন্তু বাংলাদেশে, য়ু ডিসকাভার ওয়ান মোর থিং ইন দিস পার্সুট। যে আপনি যা খুশী তাই করতে পারেন এবং য়ু ক্যান গেট অ্যাওয়ে উইথ দ্যাট। এইটা যে কী চরম স্যাটিস্ফাইং বলে বোঝানো যাবে না। আপনার অস্ট্রেলিয়ায় (আমি ক্যানবেরায় থাকি) কি আপনার কোনো দাম আছে? আপনার তো কোনো পাওয়ারই নাই। আমি কিন্তু আপনাদের লাইফ জানি। আমি লন্ডনে সাত বছর ছিলাম। আয়েম টেলিং য়ু— একবার এই লাইফের মজা পেলে বিদেশের লাইফ পুরা ডাল-ভাত মনে হবে।"*

লক্ষ্মী-কালী— দুজনের সাথেই বহুদিনের বসতবাড়ি অটোবট এলিটা ওয়ানের, জ্যাজের মতোন এতোটা এগজিসটেনশালিস্ট হয়ে ওঠেন নি। বাবা জাতীয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা তো শ্বশুর উদ্দিনময় দিনগুলোর সিংহপুরুষ। দীর্ঘদিন নীয়র্কে ছিলেন, এখন দেশে থাকেন। কিন্তু ভুলতে পারেন না নীয়র্কের নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলো। ভুলতে পারেন না সন্ধ্যার পরে বন্ধুরা মিলে বাড়ীর সামনের কোরিয়ান রেস্টারান্টে বসে নির্মল আড্ডার মুহূর্তগুলো। তার স্বপ্ন ছিলো বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস; ছ' মাস

ঢাকায় তো ছ' মাস নীয়র্কে। বাস্তবতা কঠিন; দেশে অনেক কমিটমেন্ট, নীয়র্কে বেড়াতে যাওয়া আর মাসের পর মাস থাকা তো এক কথা না। সেখানকার বন্ধুরা (নস্টালজিয়া আক্রান্ত ও দেশে বন্দী) মিলে দেশে তাই একটা মেইক-বিলিভ ওয়ার্ল্ড তৈরি করেছেন। তারা ওয়াসাবি, ইজুমিতে বসে সেই পৃথিবীতে চলে যান। আলোচনা করেন ফিল্ম ও শাড়ী নিয়ে, গাড়ী ও ফেইসবুক নিয়ে, ট্র্যাফিক জ্যাম ও ডিভোর্স নিয়ে। কিন্তু সবার জন্য এই মেইক বিলিভ ওয়ার্ল্ডটি যথেষ্ট না। চট্টগ্রামের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক পরিবারের একজন তরুণ সদস্য মাসে একবার লন্ডন যান, অপেরা কিংবা ব্যালে দেখতে। আরেকজন শুনলাম তার লেইকা এম নাইন ক্যামেরা নিয়ে আমেরিকার য়োসেমিটি ন্যাশনাল পার্কে যান ফোটোগ্রাফির জন্য, এন্সেল অ্যাডামসের ক্লাসিক ছবিগুলোর ইতিহাস পড়ে, দিনক্ষণ ও লোকেশান মিলিয়ে।

ভারতে একটি পশ্চিম-ফেরত উচ্চশিক্ষিত প্রোফেশনাল ক্লাস সৃষ্টি হয়েছে, যেটি বাংলাদেশে এখনও অনুপস্থিত। এরা অনেক টাকা মাইনে পান, কিন্তু সেটা বেতনই, ব্যবসার থোক টাকা না। বছরে ৪৫ লাখ রুপী ভারতে অনেক উপার্জন কিন্তু প্রায় সমান ১ লাখ ডলার নীয়র্কে তেমন কিছু না। তাই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতে ফিরে আসছে। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষিদেটা ভারতে মেটে না। চারদিকে 'আনএনলাইটেন্ড', 'আনসফিস্টিকেটেড' ও 'আনইন্টেলিজেন্ট' মানুষের ছড়াছড়ি। তাই এরা উইকেন্ড হোম বানাচ্ছে গোয়ায়। সেখানে গিয়ে তারা এক টুকরো 'ওয়েস্ট' খুঁজে পায়। বাংলাদেশে এই শ্রেণীটি তৈরি হয় নি কেননা অতো বেতন দিয়ে প্রোফেশনাল পোষা এখানে কঠিন, আবার উইল ডু'রা পশ্চিম ফেরত হোলেও চাকুরী করে না, বাবার ব্যবসা ধরে। উপার্জন এতোটাই বেশী যে এরা প্রপার্টি কেনে লন্ডন, নীয়র্ক কিংবা মেলবোর্নে (প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে ঢাকার অভিজাত এলাকায় প্রপার্টি কিনতে তার চাইতেও বেশী টাকা লাগে)। কিন্তু উইল ডু'দের মেইক বিলিভ ওয়ার্ল্ডটা আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং মনে হয়।

এটি ঠিক তাই যা বাংলাদেশ কখনো হবে না কিন্তু হতে গিয়ে রচনা করবে আমাদের বেদনা ও সম্ভাবনা।

আমাদের চারদিকে যে এতো ক্লেদ ও যাতনা— তা কতোক্ষণ না দেখার ভান করা যায়? উইল ডু'দের কথা শুনে মনে হয়েছে, সারা জীবন। এদের

দৃষ্টিভঙ্গি অতি স্বচ্ছ; জানি বাংলাদেশে অনেক সমস্যা, কিন্তু আমি তো এই সমস্যা সৃষ্টি করি নি। তাই আমি চোখ বন্ধ করে থাকবো, আমাকে তো সমস্যা স্পর্শ করছে না। এদের জীবনে রিয়াল আর আনরিয়ালের ভেদাভেদ কোথায় আমি বুঝে উঠতে পারি না। এমন তো নয় যে ছেলেটি অপেরা দেখতে প্রতি মাসে লন্ডন যায়, সেটিই তার কাছে সত্য ও আরাধ্য; আর বাংলাদেশ তার আসল পৃথিবীতে যাওয়ার চাবি। সেজন্যই কি তার কাছে বাংলাদেশ এতোটা 'ফান'?

গ্রীড ইজ গুড

আসল প্রশ্ন: যাদেরকে আমি উইল ডু বলছি, সেই শ্রেণীটি তৈরি হোলো কীভাবে?

বাংলাদেশের জিডিপি (অফিশিয়াল এক্সচেঞ্জ রেট) ২০০২ সালে ছিলো প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার; এখন সেটা ১০০ বিলিয়ন ডলার। এই পুরোটা সময়ে বাংলাদেশে কাজ করেছেন ভারতীয় টেক্সটাইল এঞ্জিনিয়ার রাজু ভেঙ্কাট। তার আগে তিনি কাজ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায়। পড়াশোনা করা ভদ্রলোকটি বাংলাদেশী নন বলে ধারণা করি যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তার মতামত অন্তত আমার চেয়ে নিরপেক্ষ। তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের এতো সমস্যা, অন্টাপ্রেনিওরদের নালিশের শেষ নেই, সরকারের অদক্ষতাও প্রশ্নাতীত; তারপরও বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে কীভাবে?

রাজুর উত্তর চমকে দেয়ার মতোন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষদের সাথে কাজ করেছেন বহু বছর, দেখেছেন কাছ থেকে— কিন্তু নর্থ ইন্ডিয়ান ও বাঙালি— এই দুই জাতির যে 'লোভ' তা তিনি অন্য কোথাও দেখেন নি। বাংলাদেশী অন্টাপ্রেনিওরদের মতোন সাহসী অন্টাপ্রেনিওর (উইল ডু'দের বাবারা) সারা পৃথিবীতে নেই। বুঝুক না বুঝুক একটা ব্যবসা মাথায় ঢুকলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এমন যুক্তিহীন প্রাণোচ্ছলতা একটা গরীব দেশের উন্নয়নের জন্য খুব প্রয়োজন। আলাদাভাবে ভারতের কেবল কয়েকটি রাজ্যের অর্থনীতিই কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে দ্রুত বাড়ছে। বাঙালি ও ইহুদিদের মতোন শার্প মাথাও তিনি কোথাও দেখেন নি। কিন্তু বাঙালি লীডারশিপে বিশ্বাস করে না, খুব বেশী ঈর্ষাপরায়ণ এবং

অতিরিক্ত লোভের কারণে আজকে একজন কোনো ব্যবসা শুরু করলে কাল সকাল হওয়ার আগেই আরেকজন সেই একই ব্যবসা শুরু করে দেয়, সেজন্য কেউই ঠিকমতোন দাঁড়াতে পারে না।

তাহলে ছোটো বঙ্গের বাঙালিরা ব্যবসায় এতো পিছিয়ে পড়া কেন?

মনে রাখতে হবে, বিশ্বের প্রথম মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশান ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি তাদের অপারেশান শুরু করে ছোটো বঙ্গে এবং হেন কোনো কুকর্ম নেই যা তারা করে নি (এডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অফ নেশান্সে' এর চমৎকার বর্ণনা আছে)। মার্কেটের ধুরন্ধর চালের সাথে ছোটো বঙ্গের বাঙালিরা অন্তত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দিন ধরে পরিচিতি। এমন ধারণা করাটা অমূলক যে আমাদের সাথে ওদের অন্টাপ্রেনিওরশিপের পার্থক্যটা ধর্মজাত। রাজুরও একই মত; টাকার ব্যাপারে সব ধর্মের মানুষেরই এক আদর্শ— আরো চাই। কিন্তু ছোটো বঙ্গের সাথে বড় বঙ্গের বাঙালিদের একটা বড় পার্থক্য আছে— সেটা রাজনীতির। বাংলাদেশীরা এগোয় সরকার সত্ত্বেও, সে জানে যে সরকার কোনোও সাহায্য তো করবেই না, উলটা দিতে হবে ঘুষ; তাই সে কর্মোদ্ধারে বিশ্বাসী, তা সে যেভাবেই হোক (উইল ডু...)। পক্ষান্তরে ছোটো বঙ্গের বাঙালিরা দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট শাসনে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে অন্টাপ্রেনিওরশিপ। সবকিছুতে তারা তাকিয়ে থাকে সরকারের দিকে, কখন নির্দেশ আসবে। নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার শক্তি নেই।

অলিভার স্টোনের ফিল্ম 'ওয়াল স্ট্রীটের' নায়ক মাইকেল ডগলাসের (চরিত্রটি বেপরোয়া স্টক ব্রোকারের) বিখ্যাত ওয়ান-লাইনার 'Greed, for lack of a better word, is good' বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাহলে কি সঠিক?

উপসংহার

বহু বছর আগে লুয়ি বুনুওয়েলের ফিল্ম 'দ্যা ডিস্ক্রীট চার্ম অফ দ্যা বুর্জোয়াজি' দেখে বুর্জোয়াদের অন্তঃসারশূন্যতাকে আচ্ছামতো তাচ্ছিল্য করার অভিপ্রায়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছিলাম। স্যাটায়ারটি অনবদ্য। তবে কী, পিটার সার্সটেটের সেই গানের নায়িকা, যে কথা বলে মালেনা ডিট্রীখের

মতোন— তার ডিস্ক্রীট চার্মটি এড়িয়ে যাওয়া সহজ না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে বুর্জোঁয়াদের আচরণের পুরোটাই ভান না, ওটার আয়ত্তে সাধনার প্রয়োজন আছে। আজকের পৃথিবীর ক্যাপিটালিস্টদের হাতে সে সময় নেই, আমাদের উইল ডু'দের তো আরোই নেই। সাংস্কৃতিকভাবে এরা এক আশ্চর্য প্রজাতি— বুর্জোঁয়াও হতে পারে নি, হয়েছে নেহাৎ 'ওয়ানাবি'। বহুভাবে এরা আমাদের মধ্যবিত্তকে প্রভাবিত করছে, যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে আমাদের সমাজে। মধ্যবিত্তের খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষা বদলে যাচ্ছে উইল ডু'দের কারণে। এই লেখকের ধারণা, দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে এদের প্রবেশের পর এবং হাসিনা-খালেদা উত্তর বাংলাদেশে এদের ক্ষমতা পুরোপুরি সংহত হোলেই কেবল এর ব্যাপ্তি ও তীব্রতা পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে।

বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনে মোরালিটির স্থান খুবই উপরে, রিয়ালিটি যাই হোক না কেন? নিদেনপক্ষে সেন্টার-লেফটের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী, বিশেষত মধ্যবিত্তকে না দেখলে, তার শ্রেষ্ঠত্বকে না মেনে নিলে মনে হয় দেখার ভুল হোলো। অটোবট জ্যাজ এই আন্দাজকে ধরে ফেলেছিলো সহজেই। নিম্ন ও মধ্যবিত্তের চরিত্র নিরূপণে তার অকপট প্রতিক্রিয়া আমাকে ভাবিয়েছিলো, মনে হয় উইল ডু'দের প্রকাশ ও পরিণতি— এই মতের মাঝেই নিহীত। সে বক্তব্যেই শেষ করছি এই লেখা।

"আপনার কি এখনও কোনোও বিপ্লবের ডিল্যুশান আছে? মনে হয় গরীবরা বড়লোকদের ঘৃণা করে? য়ু আর ইন ফুলস প্যারাডাইজ। যেই লোকটাকে আপনি ভাবতেছেন যে বিপ্লবে অংশ নেবে তার ভিতরে খোঁজ নিয়া দেখেন সে বড়লোকদের এই কারণে ঘৃণা করে না যে বড়লোক তাকে লাথি মারে— তার রাগ এই কারণে যে লাথিটা সে নিজে কেন মারতে পারে না। ক্যাপিটালিজমের আসল কাজটা হয়ে গেছে, এই রিয়ালিটিটা আপনারা এখনও বুঝতে পারেন না। লাথি মারাটাকে এখন আর কেউই ঘৃণা করে না। যেই ব্যাটা লাথি খায় সেও ঘুমানোর আগে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেই ঘুমায়, সে জানে অন্য কোনো সিস্টেমে অন্য কেউ বড়লোক হতে পারে, কিন্তু তাকে বড়লোক হতে হইলে এই সিস্টেমটাই দরকার।"

২০১১

কেওস-কণ্টক

The greatest tragedy in the world is not that the only underlying principle, which is recognisable, functional and ceaseless is 'chaos'— it is our predisposition to think otherwise, that there is order and harmony. Successful minority of the very few who understand this secret are busy ripping off benefits from chaos, and those who don't— namely, the majority— are busy unweaving the rainbow, leaning on to some sort of idealism.

আমাদের সমাজে আইন থাকলেও, নেই শৃঙ্খলা— এ অভিযোগ সবার মুখে। সেই দু-তিনশ বছর আগে এ অঞ্চলের মানুষ যেমন দুর্নীতির নালিশ করতো, আজোও করে; বিস্তর বর্ণনা মিলবে আমাদের সাহিত্যে, দলিল-দস্তাবেজে— যার চমৎকার বর্ণনা আছে আকবর আলি খানের *শুয়োরের বাচ্চাদের অর্থনীতিতে*। সাধারণত এ জাতীয় কথাভাজা শেষ হয় একটি আর্জি দিয়ে। আহ! এই দেশে যদি একটু আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতো, তাহলে আমরা কৈ উঠে যেতাম! সত্যিই কি তাই হতো?

আমাদের সমাজে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মতোন নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকলে অর্থনীতিকভাবে আজকে যে অবস্থানে আছি তার চেয়ে উপরে হয়তো থাকতাম, যদিও এ নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। বিশৃঙ্খল, দুর্নীতিগ্রস্ত, মিথ্যাবহুল সমাজে বেড়ে ওঠার কারণে এমন কিছু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের দৌরাত্ম্য আমাদের এখানে হয়েছে যেগুলো এখানে ভীষণ কার্যকরী ও

প্রাসঙ্গিক। যেগুলো ছাড়া দুর্ভাগ্যজনক হোলেও সত্য যে, এখন এগিয়ে যাওয়া কষ্টকর, অন্তত অর্থনীতি যখন প্রাসঙ্গিক।

পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়ার তালিম আমরা পাওয়া শুরু করি পরিবার ও স্কুল থেকে। এই প্রশিক্ষণ আমাদেরকে এক ধরনের আদর্শ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখায়, যে পৃথিবীতে ন্যায় আছে, শৃঙ্খলা আছে, আছে কার্য-কারণের মাঝে সমন্বয়। আমরা আশ্বস্ত হই যে এমন একটা পৃথিবী এই মুহূর্তে না থাকলেও ভবিষ্যতে হতে পারে অবশ্যই— আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। আমাদের মতো যাদের জন্ম তৃতীয় বিশ্বে, তারা স্বপ্ন দেখি যেন একটি সমৃদ্ধ ও সঙ্গত পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারি পরের প্রজন্মকে (মূলত নিজের দেশকে নিয়েই এই স্বপ্ন)। সমস্যা হোলো, সৃষ্টিকর্তার পৃথিবীতে শৃঙ্খলা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে আছে chaos, যা ব্যাখ্যা করা যায় শুধুমাত্র ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর। এক 'অতিপ্রাকৃত' বিশৃঙ্খলা ঘিরে রেখেছে আমাদের সর্বব্যাপী। আমরা যে তা উপলব্ধি করি না, তা না। কিন্তু মেনে নিতে মন চায় না। এক অসম্ভম তাড়না আমাদের প্রশ্রয় দেয়— বিশৃঙ্খলার ওপর শৃঙ্খলার কর্তৃত্বেই বুঝি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে মানুষ জন্মেছিলো এই কেওসকে মোকাবিলা করার জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অতি শিক্ষা মানুষের এই অপার সম্ভাবনাটিকে কিছুটা হোলেও নষ্ট করে বলে আমার অনুমান। কেওস থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি, এর মাঝে লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না, এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার কারণে সে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা বাদ নিয়ে অন্য কাজে ব্রতী হয় প্রায়ই— সে প্রথমত কেওসকে বোঝার চেষ্টা করে, দ্বিতীয়ত সে বুঝতে ব্যর্থ হয়ে এর নাম দেয় 'সমস্যা'। এই প্রস্তুতি কেবল একটি পরম সত্য থেকেই তাকে বিস্মৃত করে: কেওস থেকে নিস্তার মানুষের নেই। তবে হ্যা, কোন ধরনের কেওস নির্বাচ্য সে উদ্দামতায় মানুষের শ্রেয়তর বিচারবোধের উপযোগিতা আছে ভীষণ।

প্রবৃত্তিগতভাবে মানুষ যুক্তিপ্রবণ না, শিক্ষা তাকে যুক্তি দিয়ে ভাবতে শেখায়। শিক্ষার এই প্রক্রিয়াটা ভীষণ গোলমেলে এবং দ্বান্দ্বিক। প্রবৃত্তি বলছে প্রয়োজনে ছিনিয়ে নাও, ধর্ম বলছে প্রয়োজনে বিলিয়ে দাও। আবার ধর্ম জোর দিচ্ছে বিশ্বাসের ওপর, বিজ্ঞান বলছে যুক্তির স্থান

সবার ওপর। হিচেন্স বলছেন ইরাকের ওপর আমেরিকার আক্রমণ উচিত হয়েছে, চমস্কি বলছেন সেটা ছিলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। শেখ হাসিনা বলছেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী, খালেদা জিয়া বলছেন মুক্তিযুদ্ধে যারা উপস্থিতই ছিলো না, তারা নেতৃত্ব দেয় কী করে? এতোসব পরস্পরবিরোধী তথ্য ও মতের অনিবার্য প্রকাশ হোলো মানুষের আনপ্রেডিক্টেবিলিটি। তার যুক্তি, আবেগ, মানবতাবোধ সবকিছুই হয়ে যায় বিশেষায়িত, একই মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে, যা কোনো যুক্তি দিয়ে বিচার করা সম্ভব না। যে মানুষটি পরম বিশ্বাসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে, সে মানুষটিই অফিসে গিয়ে ঘুষ খাচ্ছে। যে মানুষটি ফুসফুসের ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যে দিনরাত ব্যয় করে গবেষণা করছে, সে-ই দুঘণ্টা পরপর ল্যাবের বাইরে গিয়ে ধোঁয়া ফুঁকে। যে মানুষটি বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস গুপ্তহত্যা নিয়ে বিচলিত ও চরম ক্রোধান্বিত, সে একই মানুষ ঘটমান বর্তমানের ঐএকই দিনে সংঘটিত গুপ্তহত্যা নিয়ে সামান্যতমও চিন্তিত না। বিষয়টি সমালোচনার না, বলতে চাইছি যে এটিই মানুষের প্রকৃতি, ক্ষমাহীন স্বভাব।

ব্যক্তি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উত্তরণে পরিস্থিতি আরোও বহু পাকে মনোহর হয়ে ওঠে। কেননা তখন মানুষের স্বভাবের সাথে যোগ হয় এমন সব এলোপাথাড়ি দৈব প্রভাবকের যার ওপর মানুষের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। স্বভাবতই সে ভীষণ বিচলিত হয়ে ওঠে। কেননা তার চারপাশের পৃথিবী, এমন কি হয়তো নিজের আচরণও কোনো সেন্স-মেইক করে না। এই উপলব্ধি একেকজনের মাঝে একেক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কেউ ভাবে যুক্তি, কেউ ভাবে বিশ্বাস— পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। কারোও আস্থা অর্জিত জ্ঞানে, কারোও আস্থা দৈব হস্তক্ষেপে— আদর্শবাদই পারে কেওস থেকে উত্তরণে, শক্তি আর নৈতিকতার শুভত্ব দিয়ে।

যাদেরকে আমরা বলি ভবিষ্যতদ্রষ্টা আর কেবল 'স্ট্রীট-স্মার্ট' বলে যারা পান না যথাযথ কৃতিত্ব (কম বয়সে যাদের অনেককেই 'চাল্লু-ম্যান' হিসেবে চিনেছি স্কুলে) তারা কিন্তু কেওসের মুখোমুখি হন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এরা কেওসের ডায়নামিক্স নিয়ে চিন্তিত নন, সমাধানেও নেই কোনো আগ্রহ। এদের চিন্তা কেবল একটিই: এই গ্যাঞ্জামে আমার জন্য কী আছে?

আলতো নজরে মনে হয় যে সব নষ্টের গোড়াই হোলো এ স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি; অতর্কিতে এ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে চলে এলে আমাদের রুচিবোধ রুষ্ট হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আমরা বেসামাল হয়ে পড়ি। কিন্তু বাস্তবতা হোলো এই 'স্বার্থপরতা' ছাড়া সভ্যতা এগোয় না (তবে এটা অর্ধসত্য; সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্বার্থপরতার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে মহানুভবতার)।

প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরালে ধারণাটা পরিষ্কার হয় অনায়াসে। বিবর্তনের একটা প্রবণতা হোলো সহজ থেকে জটিলতর অস্তিত্বের দিকে যাত্রা। প্রথমে এসেছে এককোষী প্রাণী; সেখান থেকে বহুকোষী জটিলতর প্রাণের উন্মেষ। এবার আমরা ফিরে যাই একটু পিছে, সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। প্রায় হিমালয়ের সমান একটা উল্কা প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীতে এসে আঘাত হানে মেক্সিকোর ইয়ুকাতান পেনিনসুলায়। আঘাতের বিভীষিকা: সম্মিলিতভাবে মোট ১০ কোটি এটম বোমার সমান। ফলাফল: ১৬ কোটি বছর ধরে যে ডায়নোসর চড়ে বেড়িয়েছিলো এই পৃথিবীতে দাপটের সাথে তারা হয়ে গেলো বিলুপ্ত— মানে ডায়নোসরদের কেয়ামত। শুধু ডায়নোসর কেন, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক স্পিসিস শেষ হয়ে গেলো কেবল ঐ একটি আঘাতে। ডিলেমাটি লক্ষ্য করুন, খুব মজার। যে লক্ষ-কোটি বছরের পোক্ত শৃঙ্খলা 'বিবর্তন' চাইছে শক্তিবহুল, সমর্থ প্রাণীর জয় যাত্রা— এই উল্কার কারণে মারা পড়লো তারাই সবার প্রথমে। কেবল একটি দুর্ঘটনা বদলে দিলো পুরো 'জীবনের' ইতিহাস, যেটা না হোলে মানুষের উদ্ভব হতো কি না কে জানে? যে কেওসের কথা আমি বলছিলাম তার একটা মহাজাগতিক চরিত্রও আছে। তো শেষমেশ টিকলো কারা? সবচেয়ে শক্তিশালী কিংবা বুদ্ধিমান প্রাণীটি টেকে নি, টিকেছিলো তারাই যারা এমন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে নেয়ার মতো সক্ষম ছিলো।

বিবর্তনের এই ধারার সাথে মানুষের সমাজের তফাৎ আছে বিস্তর, সত্য। কিন্তু একটা মূলসুর আমাদের সমাজেও একইভাবে কার্যকর।

পৃথিবীর ইতিহাসে কখনোই বাংলাদেশের মতো এতো ছোটো ভূ-খণ্ডে এক প্রজাতির এতো বিপুল সংখ্যক অগ্রসর স্তন্যপায়ী প্রাণী একসাথে হয়তো বাস করে নি। এমন অভূতপূর্ব ঘটনার অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া না হওয়ার কোনো কারণ নেই। বলাই বাহুল্য, আমাদের এখানে পুষ্টি, সম্পদ, সুযোগ

প্রভৃতির জন্য কাড়াকাড়ি অচিন্তনীয় রকমের উদগ্র। জীবনের বিবর্তনে যেমন, সমাজের বিবর্তনেও এমন গলা-কাটা প্রতিযোগিতায় সাড়া না দেয়ার উপায় নেই। জন্ম হচ্ছে এমন সব সক্ষমতার যেগুলোকে বর্ণনা করার মতো যুৎসই শব্দ নেই আমার তহবিলে।

আমার স্কুলবেলার এক বন্ধুর পারিবারিক ব্যবসা খুব বড়। বন্ধুটি কথায় কথায় একদিন জানালো বাংলাদেশে একটি ব্যবসায় তার আগ্রহের কথা। অংক করে দেখলাম যে ডলারের হিসাবে তার বিনিয়োগের পরিকল্পনা হোলো প্রায় আশি মিলিয়নের। আশ্চর্যের ব্যাপার হোলো এই প্রকল্পের কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় নি তখনও, শুধুমাত্র ইন্সটিঙ্কট থেকে তার এই আগ্রহ। পশ্চিমে আশি মিলিওন ডলারের বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে কোনো ধরনের মার্কেট রিসার্চ ছাড়া (পণ্যটি অভিনব কিংবা যুগান্তকারী না, রোজই কোটি মানুষ ব্যবহার করে), এটা শুনলে বলবে মাথার ডাক্তার দেখাও। কিন্তু ব্যবসাটা শুরু করলে দেখা যাবে যে সবাই ভুল ছিলো, সেই ঠিক ছিলো; লাভ হচ্ছে তরতর করে। গত বিশ বছরে বাংলাদেশী অন্টাপ্রেনিওরদের সাফল্যের মূলে যে এমন বিচিত্র বিচারবুদ্ধিরহিত উচ্ছ্বাস ও লোভ রয়েছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রশ্ন হোলো কোনো আইন ও শৃঙ্খলার দেশে এমন যুক্তিহীন প্রাণোচ্ছলতাকে ধারণ ও লালন করার উপায় আছে কি?

এই বন্ধুটিকেই প্রশ্ন করেছিলাম তারা পশ্চিমে ব্র্যান্ড শুরু করে না কেন (তাদের মূল ব্যবসা চামড়াজাত পণ্য)? অস্ট্রেলিয়ার মতো ছোটো মার্কেটে আশি মিলিয়ন ডলারের এক শতাংশের চেয়েও কম বিনিয়োগ করে বহু সফল ব্র্যান্ড বেরুচ্ছে হরহামেশা। এখানে আইন-কানুন আছে, বিশাল অঙ্কের লাভ আছে, নেই চাঁদাবাজি-রাজনৈতিক উপদ্রব, নেই লোডশেডিং। এখানে তো ব্যবসা করা অনেক সহজ হওয়ার কথা। কিন্তু না, পশ্চিমে আমার বন্ধুর বা বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের স্টার্ট-আপ ব্যবসায়ে কোনো আগ্রহ নেই। ঐ যে বলছিলাম, বিশৃঙ্খলার মাঝে একটা স্ট্র্যাটেজিক এডভান্টেজ আছে, এটা কেউ খোয়াতে রাজী নয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হোলো বিশৃঙ্খলা যদি কারো স্ট্র্যাটেজিক এডভান্টেজ হয়, রাষ্ট্রের সেখানে কী করার আছে? এর উত্তর আমার জানা নেই। জানা নেই এজন্য যে এমন প্রশ্নের উত্তরে চোখা-চিন্তার সুযোগ কম। যে সমস্যায়

এক-দুজন না, পুরো সমাজটা জড়িত, সে সমস্যায় আমরা কার্যকারিতার চেয়ে নৈতিকতার মানদণ্ডকে প্রাধান্য দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আর নৈতিকতা এমনই এক ব্যাখ্যাক্রান্ত বিষয় যে এ নিয়ে ভাবাবেগবর্জিত আলোচনা করা এক কথায় অসম্ভব।

তাহলে এই কেওস-কন্টক পৃথিবীতে আমার আপনার জন্য কী করার আছে?

প্রথমে একটা কথা আবারো স্মরণ করিয়ে দেবো যে কেওস থেকে মানুষের নিস্তার নেই, তা আপনি যেখানে যে দেশেই থাকুন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এমন কেওসের ব্যবস্থা করেছি যেটা খুব আদিম ও বন্য। এমন বিশৃঙ্খলায় লাভবান হতে চাইলে প্রায়ই ইতরামির শরণাপন্ন হতে হয়।

কেবল একটিই কথা বলার আছে আমার। ইনটুয়িশানকে (শব্দটির কোনো যুৎসই বাংলা জানা নেই আমার। সহজ ভাবে বলা যেতে পারে 'মন যা বলে') প্রাধান্য দিন সবার আগে, এমন কি নৈতিকতারও আগে।

আমরা মানুষেরা, নৈতিকতার প্রশ্নকে কীভাবে মোকাবেলা করি বলুন তো? আমার ধারণা, বেশীরভাগ পাঠক উত্তর করবেন যে আমরা ভেবে-চিন্তে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হোলে সিদ্ধান্ত দেই যে ব্যাপারটি অনৈতিক। দুঃখের বিষয়: মানুষের মাথা এভাবে কাজ করে না। সে প্রথমে চিন্তা করে না। হুট করে সিদ্ধান্তে আসে, তারপরে নিজের মতোন করে যুক্তি খাড়া করে। এই যুক্তিগুলোও খুব মজার। সে যদি মনে করে কোনো একটি বিষয় অনৈতিক, তাহলে সে কল্পনায় কাউকে না কাউকে ভিক্টিম বানাবেই, বাস্তব যাই হোক না কেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচারে নৈতিকতার ব্যাপারটি ইনটুয়িটিভ, র‍্যাশনাল না। সমস্যা হোলো ঐ যে হুট করে সিদ্ধান্তে আসা— এই প্রক্রিয়াটাকে মানুষ স্বীকার করতে চায় না, মনুষ্যত্বের অবমাননা হবে বলে। আমি বলছি, হুট করেই যদি সিদ্ধান্তে আসি— না ভেবে-চিন্তে— তাহলে ঐ একটি সিদ্ধান্তের প্রতিই এতো আস্থা কেন?

ইনটুয়িশান যদি বলে কাউকে খুন করতে তাহলে কি তাকে খুন করতে হবে? না, অবশ্যই তা না কিন্তু মানুষের বাস্তব সমস্যায় 'সঠিকত্ব' বা

'ন্যায়বিচারই' একমাত্র বিচার্য না— আরোও বহু দিক আছে। নৈতিকতার বাঁধন অনেক সময়ই এই দিকগুলো দেখতে দেয় না (এ প্রবণতাটা খুব সহজেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়)। আমার প্রস্তাব শুধু এতোটুকু যে ইনটুয়িশানকে অগ্রাধিকার দিলে এমন বহু সুযোগ, বহু সমস্যার সমাধান আপনি দেখতে পাবেন যেটা নৈতিকতার চশমা পরে থাকলে নাও দেখতে পারেন।

কেওস-কন্টক পৃথিবীতে সাফল্যের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সক্ষমতার। যে নৈতিকতা সক্ষমতাকে নিস্তেজ করে সে নৈতিকতাকে মহিমান্বিত করার আগে দুবার প্রশ্ন করুন, হয়তো কাজে দেবে।

২০১২

শরীরী প্রেম

কার্ল ফন কোজেল আমাদের সমস্যায় ফেলেন, গভীর সমস্যায় ফেলেন— দিনরাত নষ্ট করা অস্বস্তি এক।

তার গল্পের প্রথম অংশটুকু শুনতে খারাপ লাগবে না। কান পাতি আসুন।

প্রথম দেখায় মনে হবে যে সত্যজিৎ রায় এই লোককে দেখেই প্রোফেসর শঙ্কুর ছবি এঁকেছিলেন। প্রোফেসর শঙ্কুর মতো এই জার্মান শাদা-দাড়িও বিজ্ঞানী— তবে সেটা কেবল তার নিজের দাবী। ১৯২৬ এ ফ্লোরিডায় চলে আসেন। বলে রাখা ভালো যে ফ্লোরিডা পৌঁছানোর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন এবং তার আগে সম্ভবত ভারতেও ছিলেন (১৯২২ এ জন্ম নেয়া মেয়ে আয়েশা ট্যানজলারের নামের বানান— Ayesha। আমার ধারণা তিনি ভারতে সত্যিই ছিলেন— নইলে বানানটা হতো Aisha অথবা A'isha) আমেরিকায় এসে চাকরির জন্য কি না জানি না— অনেক মিথ্যা বলতে শুরু করেন। ৯টা কলেজ ডিগ্রী আছে, আগে সাবমেরিনে কাজ করতেন এই জাতীয় গপ্পোবাজি। নামটাও বদলে ফেলেন— আগে ছিলো কার্ল ট্যানজলার (Carl Tanzler) এখন কার্ল ফন কোজেল (Carl von Cosel)। বন্ধুরা বলে 'কাউন্ট' কার্ল ফন কোজেল— এলাহী কারবার। চাকরি শুরু করলেন কী ওয়েস্ট হসপিটালের টিউবারকিলোসিস ওয়ার্ডে এক্স-রে টেকনিশিয়ান হিসেবে।

তখনও যক্ষার চিকিৎসা আবিষ্কার হয় নি। জানা আছে যে দরিদ্রদের মধ্যে যক্ষার প্রকোপটা বেশী। এমনই এক গরীব ঘরের মেয়ে মারিয়া এলেনা মিলাগ্রো ডি হোয়োস। কিউবান-আমেরিকান, বয়স মাত্র ২১, অনিন্দ্য সুন্দরী এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। প্রেমে পড়ে যান ফন কোজেল।

শরীরী প্রেম

কার্ল ফন কোজেল আমাদের সমস্যায় ফেলেন, গভীর সমস্যায় ফেলেন— দিনরাত নষ্ট করা অস্বস্তি এক।

তার গল্পের প্রথম অংশটুকু শুনতে খারাপ লাগবে না। কান পাতি আসুন।

প্রথম দেখায় মনে হবে যে সত্যজিৎ রায় এই লোককে দেখেই প্রোফেসর শঙ্কুর ছবি এঁকেছিলেন। প্রোফেসর শঙ্কুর মতো এই জার্মান শাদা-দাড়িও বিজ্ঞানী— তবে সেটা কেবল তার নিজের দাবী। ১৯২৬ এ ফ্লোরিডায় চলে আসেন। বলে রাখা ভালো যে ফ্লোরিডা পৌঁছানোর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন এবং তার আগে সম্ভবত ভারতেও ছিলেন (১৯২২ এ জন্ম নেয়া মেয়ে আয়েশা ট্যানজলারের নামের বানান— Ayesha। আমার ধারণা তিনি ভারতে সত্যিই ছিলেন— নইলে বানানটা হতো Aisha অথবা A'isha) আমেরিকায় এসে চাকরির জন্য কি না জানি না— অনেক মিথ্যা বলতে শুরু করেন। ৯টা কলেজ ডিগ্রী আছে, আগে সাবমেরিনে কাজ করতেন এই জাতীয় গপ্পোবাজি। নামটাও বদলে ফেলেন— আগে ছিলো কার্ল ট্যানজলার (Carl Tanzler) এখন কার্ল ফন কোজেল (Carl von Cosel)। বন্ধুরা বলে 'কাউন্ট' কার্ল ফন কোজেল— এলাহী কারবার। চাকরি শুরু করলেন কী ওয়েস্ট হসপিটালের টিউবারকিলোসিস ওয়ার্ডে এক্স-রে টেকনিশিয়ান হিসেবে।

তখনও যক্ষার চিকিৎসা আবিষ্কার হয় নি। জানা আছে যে দরিদ্রদের মধ্যে যক্ষার প্রকোপটা বেশী। এমনই এক গরীব ঘরের মেয়ে মারিয়া এলেনা মিলাগ্রো ডি হোয়োস। কিউবান-আমেরিকান, বয়স মাত্র ২১, অনিন্দ্য সুন্দরী এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। প্রেমে পড়ে যান ফন কোজেল।

শুরু হোলো উপহারের পালা— আজ এটা তো কাল সেটা। কিন্তু হোয়োস কোনো সাড়া দেয় না; ২১ বছরের মেয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ৫২ বছরের 'বুড়ার' প্রেমে পড়ার কথাও না। কিন্তু ফন কোজেল তরফে ভাবনা: রোগটা সারানো গেলে নির্ঘাত প্রেমের দাবী তৈরি হবে।

ফন কোজেল নিজে ডাক্তার ছিলেন না কিন্তু ওস্তাদী করতে পিছপা হোলেন না। হোয়োসের গরীব পরিবার সম্মতিও দিলো। এলেকট্রিক শক, রেডিয়েশন থেরাপি, বিচিত্র সব কেমিকেল আর গাছগাছড়া— সবেরই প্রয়োগ হোলো কিন্তু বাঁচানো গেলো না মেয়েটাকে। ১৯৩১ এ মারা গেল হোয়োস।

যারা মনে করছেন যে গল্পের শেষ এখানেই তারা ভুল করলেন। গল্প সবে শুরু।

পশ্চিমে ফিউনেরাল খুব শস্তা জিনিস না। এ ব্যয়ভার বহন করলেন প্রায়-অপরিচিতজন ফন কোজেল। শুধু তাই না, তিনি একটা বিশাল স্মৃতিসৌধও তৈরি করলেন। লালবাগে পরীবিবির স্মৃতিসৌধটা যে রকম। বড় একটা ঘর, মাঝখানে শুধু সার্কোফ্যাগাস। একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা। কফিনে দাফন করলে জমিনের পানির জন্য লাশ পচে যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু বন্ধ পাকা ঘরে সার্কোফ্যাগাসের মধ্যে ময়শ্চার কম। তাই লাশ গলবে দেরীতে।

সময় পাওয়া গেলো।

সারাদিন অফিস করে রাতে কবরে চলে যান ফন কোজেল। হোয়োস পরিবার জানে যে এ লোক হোয়োসের প্রেমে পড়েছিলো সত্যিই। তাই তারা ভদ্রলোকের মানসিকভাবে ভেঙে পড়াটাকে ভালোবাসার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই ধরে নেয়। যে ঘরে হোয়োসের কবর সে ঘরের দুটো চাবি। অন্যটা হোয়োসের বোনের কাছে। কিন্তু পরিবার জানে না রাতে গিয়ে ফন কোজেল কী করে? ফন কোজেল আসলে সার্কোফ্যাগাসের মধ্যে ফর্মালডিহাইড আর অন্যান্য মশলাপাতি দিয়ে লাশটাকে সংরক্ষণ করতে চাইছিলেন কাউকে না জানিয়ে।

তখনকার দিনে আরো একটা চল ছিলো। মারা যাওয়ার পরপরই ডেথ মাস্ক বানানো হতো— মানে প্লাস্টার অফ প্যারিস জাতীয় কিছু দিয়ে মুখের একটা ছাঁচ বানানো হতো এবং এই ছাঁচ অনুযায়ী আবক্ষ মূর্তি। রাজা রামমোহন রায়েরও ডেথ মাস্ক বানানো হয়েছিলো। ফন কোজেল ডেথ মাস্ক তৈরি করলেন হোয়োসের।

দু বছর ধরে সংসার করতে থাকলেন ওই ছোট্ট স্মৃতিসৌধে। রোজ যান, কথা হয় হোয়োসের সাথে। একটা ফোনও লাগালেন প্রিয়তমার সাথে কথা বলার জন্য— ঠিক কবরের মধ্যে। এভাবে চললো দু বছর।

তারপর হুট করে আর তাকে দেখা যায় না। চাকরিও গেলো চলে হাসপাতাল থেকে— প্রেম খুব ঘন বলে কথা। একদিন দুইদিন করতে করতে দশ বছর চলে গেলো মারা যাওয়ার কিন্তু ফন কোজেলের দেখা নেই। হোয়োসের বোনের কেন যেন সন্দেহ হোলো, বুড়োর তো কবরে আসার কথা। স্মৃতিসৌধে গিয়ে খোঁজ লাগাতে গিয়ে যে ভয়টা সবাই পাচ্ছিলো সেটাই সত্য হোলো। সার্কোফ্যাগাসে হোয়োসের লাশ নেই।

ফন কোজেল বহু আগেই লাশটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি দূরে ছোট্ট একটা বাসায় ওঠেন এবং সেখানে নিয়ে যান হোয়োসের মৃতদেহ। বড় একটা বিছানার এক পাশে ফন কোজেল আর অন্য পাশে হোয়োস। দশ বছর ধরে লাশ নষ্ট না করার জন্য বিশেষ ধরনের চেম্বার এবং টেকনোলজি প্রয়োজন, বাড়ীর ভেতরে সে ব্যবস্থা করা আশি বছর আগে সম্ভব ছিলো না। তাই লাশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। প্রচুর পারফিউম, নানান ধরনের তেল ও কেমিকেল ব্যবহার করে ফন কোজেল চেষ্টা করছিলেন প্রিয়তমাকে রক্ষা করার জন্য। মারা যাওয়ার পরপরই তার চুল কেটে রাখা হয়। সেই চুল আর গলে ঝড়ে পড়া চুল দিয়ে তৈরি করা হয় উইগ। আর ডেথ মাস্ক ব্যবহার করে তৈরি হয় মোমের মুখোশ। চোখের কটোরে ঢোকানো হোলো মার্বেলের চোখ। হাড়গুলো জোড়া রাখা হোলো পিয়ানোর তার দিয়ে। নষ্ট হয়ে যাওয়া চামড়ার জায়গায় সিল্ক আর মোমের জগাখিচুড়ি— বীভৎস এক পুতুল। পরিয়ে রাখা হয় বিয়ের গাউন।

ফন কোজেলের মতে এটা তার সুখের সংসার। প্রিয়তমাকে তিনি গান শোনান, পিরীতের কথা বলেন— উত্তর যেহেতু আসে না, সংসার হয়ে ওঠে সাবলীল।

এদিকে হোয়োসের বোন মুখোমুখি হয় ফন কোজেলের। জিজ্ঞেস করলো তার বোনের লাশের কথা। ফন কোজেলের গলায় কোনো ভয় কিংবা ক্ষোভ ছিলো না। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় তিনি বললেন হোয়োসের সাথে তার সুখের সংসারের কথা। দেখাতেও নিয়ে গেলেন ওপর তলায় এবং বললেন আবার আসতে তার বোনের সংসার দেখে যাওয়ার জন্য।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কল্পনা করুন আপনার বোনের দশ বছরের পুরনো লাশ আরেকজনের বিছানায় এবং আপনি তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভয়ার্ত বোন ছুটে গেলো পুলিসের কাছে। এরপর রাষ্ট্র হোলো পুরো ঘটনা। সেন্সেশেনাল ঘটনা, পুরো দেশের মনোযোগ ফ্লোরিডা কীতে। ময়না তদন্ত হোলো হোয়োসের শরীর, জিজ্ঞেস করা হোলো বুড়োকে। বিচার বসলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সায়কায়াট্রিস্টরা জানালো যে ফন কোজেল মানসিকভাবে অসুস্থ নন।

১৯৫২ সালে ৮৩ বছর বয়সে ফন কোজেল স্বাভাবিকভাবে মারা যান নিজের ঘরে। মারা যাওয়ার সময় একটা লাইফ সাইজের পুতুলকে তিনি জড়িয়ে ধরে ছিলেন। পুতুলের মুখে ডেথ মাস্ক দিয়ে বানানো মুখোশ। তার ডায়েরীর শেষ কথা ছিলো:

"Human jealousy has robbed me of the body of my Elena .... yet divine happiness is flowing through me .... for she has survived death for ever .... for ever she is with me."

বলে রাখা ভালো যে, সে সময়ে ফন কোজেলের প্রেমের এই ঘটনাকে খুবই রোম্যান্টিক ভাবা হতো। ব্যাটা পাগল কিন্তু ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। কিন্তু এখন আর ফন কোজেলকে সেভাবে দেখা হয় না।

হোয়োসের ময়না তদন্ত যারা করেছিলেন তারা ১৯৭০ এর দিকে বোমা ফাটান। সময় এবং সমাজটা ভিন্ন বলে সে সময়ে একটা সত্য তারা চেপে গিয়েছিলেন। ফন কোজেল হোয়োসের যোনীপথে একটা টিউব

বসিয়েছিলেন এবং টিউবের শেষ প্রান্তে তারা তুলার মধ্যে সীমেন খুঁজে পেয়েছিলেন।

ফন কোজেল হোয়োসের মৃত দেহের সাথে যৌনসঙ্গম করতেন, তিনি ছিলেন নেক্রফিলিয়ায় আক্রান্ত।

আসলেই তিনি হোয়োসের সাথে সেক্স করতেন কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই যেহেতু সমসাময়িক কোনো প্রমাণ নেই এই দাবীর সপক্ষে। তবে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এই বাজে কাজটা করে আসছে এবং ফন কোজেলের বাকী কাজ নেক্রফিলিয়ার ইঙ্গিতই দেয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আপনার ওপর। এই হোলো পাঠক; ফন কোজেলের গল্প।

আপাত দৃষ্টিতে খুবই ডিস্টার্বিং এই ঘটনা— অস্বীকার করবো না— তবে সেটা গল্পের একটা লেয়ার। অন্য অনেক লেয়ারে গল্পটা আমার কাছে ফ্যাসিনেটিং।

কেন?

কারণ ফন কোজেল আমাদের এমন সব গুরুতর দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি করেন যার কোনো সহজ ব্যাখ্যা নেই। আমার মনোযোগ এই গল্পের খুটিনাটিতে না বরং মানুষ এই ঘটনায় কীভাবে রিএক্ট করেছে যুগ যুগ ধরে— সেখানেই আছে এলেম।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন: who owns death?

যারা দর্শন পড়ান তারা মোরালিটি এবং ইথিক্স এর ফারাক নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেন— সে পথ আমাদের না। তবে খুব মোটা দাগে— মানে অশ্লীল রকমের মোটা দাগে মোরালিটিকে বলা যেতে পারে ব্যক্তি পর্যায়ের নৈতিকতা আর ইথিক্স হোলো ব্যক্তি, সমাজ পর্যায়ে যে নৈতিকতার প্রয়োগ করে। আপনি ঘুষ খান না— এটা মোরালিটির প্রশ্ন কিন্তু বিশাল একটা প্রতিষ্ঠানের কর্তা হিসেবে আপনি কর্মরত মেয়েদের মা হওয়া-জনিত ছুটি দেবেন কি না— সেটা ইথিক্সের প্রশ্ন।

একটা ছোটো কিন্তু আছে। আমরা মানুষ ইথিক্সের প্রশ্ন তখনই তুলি যখন সে প্রসঙ্গে আমাদের ঔনারশিপ থাকে। অপ্টামাস প্রাইম অটোবট এলিটার সম্পত্তি মেরে খেলে আমাদের মনে কোনো ইথিক্সের প্রশ্ন জাগে না কারণ সাইবাট্রন গ্রহকে আমরা ঔন করি না।

মৃতের সৎকারের সাথে পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ মানি কিন্তু মূলত এটা ইথিক্সের প্রশ্ন। তাই যদি হয় তাহলে মৃত্যু অর্থাৎ এক্ষেত্রে মৃতদেহকে ঔন করছে কে? মৃত ব্যক্তিটি, মৃতের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, মাটি না আল্লাহ?

যাকেই আপনি ফন কোজেলের গল্প বলবেন সেই প্রথমে বলবে য়াক, ডিজগাস্টিং। মন বলে, ফন কোজেল কাউকে বা কিছু একটা ভায়োলেট করেছেন। এই 'কেউ' টা কে? বেশীরভাগ মানুষ প্রথমেই বলবেন যে ফন কোজেল হোয়োসের শরীরকে ভায়োলেট করেছেন যেহেতু হোয়োসের শরীর ব্যবহার করা হয়েছে অনুমতি ছাড়া। ঠিক এই কাজটা আমরা বছরের পর বছর ইজিপশিয়ান ফারাওদের মমি প্রদর্শন করে (ফারাওরা কি অনুমতি দিয়েছিলেন তাদের মৃতদেহ জাদুঘরে রাখার?)। মানুষ কি তাহলে মৃত্যুর পর তার দেহের ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে?

অন্তত ত্রিশ বছর মানুষ জেনেছে যে ফন কোজেল দশ বছর ধরে একটা লাশের সাথে ঘর-বসতি করেছিলেন— এতে তারা প্রশ্রয় সূচক বিস্ময়ে অস্বস্তি প্রকাশ করেছে মাত্র। কিন্তু যখন জেনেছে যে তিনি হোয়োসের মৃত শরীরের সাথে যৌনতাও সম্পন্ন করতেন তখন তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে— ব্যাটা একটা অসুস্থ দানব। কথা হোলো— কারো তো অজানা ছিলো না যে ফন কোজেলের নিজের মতে তিনি সংসার করছিলেন হোয়োসের সাথে (আদালতেও তিনি এ সাক্ষ্যই দিয়েছিলেন)। যে মানুষ একটা লাশকে বিছানার পাশে রেখে দশ বছর ঘর করতে পারে তার জন্য সে লাশের ওপরে ওঠা আর এমন কি?

আমরা মানুষ যে নৈতিকতা নির্ণয়ে কোনো যুক্তি মানি না— সম্ভবত এ ঘটনাও তার একটা প্রমাণ।

আবার

পশ্চিমের মানুষেরা নৈতিকতার প্রশ্নকে ‘ক্ষতি’ দিয়ে মাপে। অর্থাৎ কোনো কিছু যদি কারো কোনো ক্ষতি না করে তাহলে তা অনৈতিক না (আমরা আবার এরকম না। কেউ বাংলাদেশের পতাকার ডিজাইনের লাল-সবুজ আন্ডারওয়েয়ের পরে এবং কাউকে সে যদি তা নাও দেখায় তাহলেও তা অনৈতিক)। কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করুন যে হোয়োসের বোনটি যদি ‘৪২ এ মারা যেতো তাহলে হয়তো কেউই কোনোদিন জানতো না যে বুড়া মৃত শরীরের সাথে সেক্স করে। সেক্ষেত্রে কিন্তু কারো কোনো ‘ক্ষতি’ হয় না। মনে রাখতে হবে যে ফন কোজেল ঠিক টেড বান্ডী না— মানে তিনি মৃতের সাথে সেক্স করার জন্য জীবিতকে হত্যা করেন নি। কেউ যদি একটা মৃত মানুষের সাথে সেক্স করে এবং সে ছাড়া অন্য কেউ যদি তা জানতে না পারে এবং আরেকটা শর্ত যদি আমরা কল্পনায় যোগ করে নিই যে এই সঙ্গমে কোনো রোগ বাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই— তাহলে পিওর রিজনের দিক থেকে এই বন্দোবস্তে কারো কিন্তু কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। সেক্ষেত্রেও কি নেক্রফিলিয়া অনৈতিক?

আমার ধারণা, যারা হার্ম প্রিন্সিপাল ধরে নৈতিকতার শুমার করেন তাদের অধিকাংশও এ কাজটাকে অনৈতিক বলবেন। মানুষ যে নৈতিকতার প্রশ্নে প্রথমে ইন্সটিঙ্কটিভলি সিদ্ধান্তে আসে তারপর সুবিধামতোন যুক্তি দিয়ে তার পেছনের সিদ্ধান্তকে জাস্টিফাই করে— এ ঘটনা হয়তো তার আরো একটি প্রমাণ দেবে।

আমার সবশেষ পর্যবেক্ষণ: মানুষ এক অদ্ভূত কারণে জীবিতের শরীরের প্রশ্নে পবিত্রতাকে প্রাসঙ্গিক মনে করে না কিন্তু মৃতের শরীর— যা নিথর এবং পচনশীল— তাকে মনে করে পবিত্র। ফন কোজেল কোনো নিথর মরদেহ না, পবিত্রতা প্রসঙ্গে আমাদের যে অলংঘনীয় উচ্চ ধারণা— সম্ভবত তার ওপরেই সওয়ার হয়েছিলেন।

২০১৪

বাংলাদেশের আস্তিক-নাস্তিক বাইনারী নিয়ে একটি 'বিজ্ঞানমনস্ক' আলোচনা

বাংলাদেশে 'বিজ্ঞানমনস্ক' বলে একটা টার্ম আছে। সম্ভবত যারা বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা করেন নি কিন্তু পরিপার্শ্বকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেন তাদের নির্দিষ্ট করতে এই টার্মটি ব্যবহার করা হয়। এই নির্দিষ্টকরণে একটা ফাঁক আছে। পরিপার্শ্বকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানকে একেবারেই ব্যবহার করেন না, এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশী আছেন বলে আমার মনে হয় না। যাদের আমরা গণ্ডমূর্খ ধরে নিয়ে নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক বলে ঢেকুর তুলি, তারাও অনেক কিছু বোঝার জন্য রিপিটেবল অবজারভেশন এবং যুক্তি ব্যবহার করেন। হ্যা, তাদের হয়তো দিলখুশ সংজ্ঞা জানা নেই, হয়তো তারা তাদের অবজারভেশনকে গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারেন না কিন্তু তারা অতশত না জেনেও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেন।

কিন্তু তাদেরকে আমরা বিজ্ঞানমনস্ক বলি না— কারণ দুয়েকটি ব্যাপারে তারা বিজ্ঞানমনস্ক হোলেও তাদের জীবনে অবিজ্ঞানমনস্কতা আছে বেএন্তেহা— তারা তুকতাকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কতোটুকু অবিজ্ঞানমনস্কতা আপনার মনকে এতোটাই দূষিত করে ফেলে যে একজনকে আর বিজ্ঞানমনস্ক বলে আর ঠাওর করা যাবে না, এ ব্যাপারে কোনো কনসেনসাস নেই।

হয়তো তারা বোঝান যে পরিপার্শ্বকে বোঝার জন্য যারা 'কেবলমাত্র' বিজ্ঞানলব্ধ এবং বিজ্ঞানচর্চিত জ্ঞানকেই সঠিক ও নিরাপদ মনে করেন তারাই বিজ্ঞানমনস্ক।

ফিজিকাল ওয়ার্ল্ডকে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রক্রিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় হোলেও মানুষ তার পরিপার্শ্বকে বোঝার সময়ে ফিজিকাল ও মেটাফিজিকাল— ব্যাপার দুটোকে সবসময় খাড়া দাগে আলাদা করতে পারে না। আমাদের সবার মাঝে একটা উদগ্র ও অনিঃশেষ বাসনা আছে— আমরা জানতে চাই। আমরা সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই। এ কথা সত্য যে বেশীরভাগ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিজ্ঞানই যথেষ্ট এবং বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু এমন কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। তার কারণ এই না যে বিজ্ঞান ইনফেরিয়র— কারণ সে সব প্রশ্ন বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। সমস্যা হোলো— ঠিক এই প্রশ্নগুলোই মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রশ্ন।

যেমন ধরুন 'জগৎ সংসারে আমি কেন এসেছি'— প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনো সময়ে কিংবা সারাজীবন এই প্রশ্নটি তাড়িয়ে বেড়ায়। কোনো বিজ্ঞানী কোনোদিনও এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু স্টিভেন হকিন্স এর উত্তর দিতে পারবেন না বলে কি আপনি আপনার জানার তেষ্টাকে অনিবারিত করে রাখবেন? অবশ্যই না। কোনো ধরনের দর্শন ছাড়া এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর নেই— এটাই পরমসত্য এবং এখানেই ধর্মের উপযোগিতা (ধার্মিকদের কাছে ধর্মের আরো অনেক উপযোগিতা আছে)।

আপনি যখন বলবেন যে বিজ্ঞানই আমার পরিপার্শ্বকে বোঝার একমাত্র সহায় তখন আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে: আপনার মাথাকে বোঝাতে হবে যে মেটাফিজিকাল প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই, তাই এর উত্তরেরও কোনো প্রয়োজন নেই। অথবা যেহেতু এসব প্রশ্নের 'নির্ভুল' উত্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই তাই আমি এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত না। বলাই বাহুল্য, যেকোনো প্রশ্নের উত্তর জানার যে হিউম্যান স্পিরিট তার সাথে এ ধরনের অবস্থান সঙ্গত না। তাই বেশীরভাগ মানুষ দুটো গিয়ারে চলেন অর্থাৎ তারা ফিজিকাল এবং মেটাফিজিকাল প্রসঙ্গকে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝার চেষ্টা করেন এবং স্বভাবতই তাদের 'বিজ্ঞানমনস্কতার' ভেতরে 'অবিজ্ঞানমনস্কতা' ঢুকে পড়ে।

বাংলাদেশের অনলাইনস্ফেয়ার প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞানমনস্কতা একটা আলাদা আলোচনাও দাবী করে।

অনেকের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে তারা নাস্তিকতা, মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা— এই টার্মগুলোকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করেন। সে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ প্রমাণে এই শব্দ এবং শব্দবন্ধগুলো টেনে আনেন। আমার ধারণা, তারা বিজ্ঞান না বোঝার কারণে এই ভুলগুলো করেন। খুলে বলি। নাস্তিকতা, শেষ বিচারে একটি দার্শনিক অবস্থান, কোনো বৈজ্ঞানিক অবস্থান না। খোদাতালা আছেন কিংবা নেই— কোনোটিই আপনি 'প্রমাণ' করতে পারবেন না। এবং খোদাতালায় বিশ্বাস করা বা না করা— কোনোটিই আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের কোনো স্বাক্ষর না। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ৫ জন ম্যাথমেটিশিয়ানের একজন গিয়োর্গ কানটোর দাবী করতেন যে খোদাতালা তার কানে কানে গণিত নিয়ে কথা বলতেন। আল্লাহতে বিশ্বাস করা এবং খোদাতালার কানে কানে গণিত নিয়ে কথা বলার কারণে কানটোর; হুমায়ুন আজাদ কিংবা তসলিমা নাসরিনের চেয়ে ইন্টেলেকচুয়ালি ইনফেরিয়র— এমন দাবী যিনি করবেন তার সাথে যদি কানে কানে পাহাড়-নদী, মামদো ভূত ও সুচিত্রা সেন কথা বলেন রোজ— ওষুধ খাওয়ার আগে— শুনলে আশ্চর্য হবো না।

বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মোটা মোটা বই এসপার-ওসপার করে দেয়া না, সুন্দর করে বাংলা আর ইংরেজি লেখা না; বরং জ্ঞান সৃষ্টি করা। টমাস এডিসন পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ একজন ইনভেনটর। তার সাথে কাজ করেছিলেন ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কয়েকজন বিজ্ঞানীদের একজন; নিকোলা টেসলা। টেসলার মতামত যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই তাহলে ধরে নেয়া যায় যে টমাস এডিসন আদতে একজন গাড়ল ধরনের মানুষ ছিলেন। মানে খুবই পরিশ্রমী কিন্তু পড়ালেখা জানেন না তেমন, বুদ্ধিও খুব বেশী না। নিঃসন্দেহে আমাদের ব্লগস্ফেয়ারের অনেক মানুষ এডিসনের চেয়ে বেশী পড়ালেখা জানা মানুষ— কিন্তু তারা 'জ্ঞান'কে সমৃদ্ধ করতে পারেন নি এতোটুকু— যেটা এডিসন পেরেছিলেন।

জ্ঞান সৃষ্টি করার সাথে পরিশ্রম, কল্পনাশক্তি আর ইন্সপিরেশান জড়িত— খোদাতালায় বিশ্বাস করা বা না করার সাথে এর প্রায় কোনোই যোগাযোগ

বাংলাদেশের অনলাইনস্ফেয়ার প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞানমনস্কতা একটা আলাদা আলোচনাও দাবী করে।

অনেকের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে তারা নাস্তিকতা, মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা— এই টার্মগুলোকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করেন। সে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ প্রমাণে এই শব্দ এবং শব্দবন্ধগুলো টেনে আনেন। আমার ধারণা, তারা বিজ্ঞান না বোঝার কারণে এই ভুলগুলো করেন। খুলে বলি। নাস্তিকতা, শেষ বিচারে একটি দার্শনিক অবস্থান, কোনো বৈজ্ঞানিক অবস্থান না। খোদাতালা আছেন কিংবা নেই— কোনোটিই আপনি 'প্রমাণ' করতে পারবেন না। এবং খোদাতালায় বিশ্বাস করা বা না করা— কোনোটিই আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের কোনো স্বাক্ষর না। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ৫ জন ম্যাথমেটিশিয়ানের একজন গিয়োর্গ কানটোর দাবী করতেন যে খোদাতালা তার কানে কানে গণিত নিয়ে কথা বলতেন। আল্লাহতে বিশ্বাস করা এবং খোদাতালার কানে কানে গণিত নিয়ে কথা বলার কারণে কানটোর; হুমায়ুন আজাদ কিংবা তসলিমা নাসরিনের চেয়ে ইন্টেলেকচুয়ালি ইনফেরিয়র— এমন দাবী যিনি করবেন তার সাথে যদি কানে কানে পাহাড়-নদী, মামদো ভূত ও সুচিত্রা সেন কথা বলেন রোজ— ওষুধ খাওয়ার আগে— শুনলে আশ্চর্য হবো না।

বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মোটা মোটা বই এসপার-ওসপার করে দেয়া না, সুন্দর করে বাংলা আর ইংরেজি লেখা না; বরং জ্ঞান সৃষ্টি করা। টমাস এডিসন পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ একজন ইনভেনটর। তার সাথে কাজ করেছিলেন ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কয়েকজন বিজ্ঞানীদের একজন; নিকোলা টেসলা। টেসলার মতামত যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই তাহলে ধরে নেয়া যায় যে টমাস এডিসন আদতে একজন গাড়ল ধরনের মানুষ ছিলেন। মানে খুবই পরিশ্রমী কিন্তু পড়ালেখা জানেন না তেমন, বুদ্ধিও খুব বেশী না। নিঃসন্দেহে আমাদের ব্লগস্ফেয়ারের অনেক মানুষ এডিসনের চেয়ে বেশী পড়ালেখা জানা মানুষ— কিন্তু তারা 'জ্ঞান'কে সমৃদ্ধ করতে পারেন নি এতোটুকু— যেটা এডিসন পেরেছিলেন।

জ্ঞান সৃষ্টি করার সাথে পরিশ্রম, কল্পনাশক্তি আর ইন্সপিরেশান জড়িত— খোদাতালায় বিশ্বাস করা বা না করার সাথে এর প্রায় কোনোই যোগাযোগ

নেই। জ্ঞান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে খোদাতালায় বিশ্বাস করা প্রতিবন্ধক; এমন বিতর্কে যে কাওকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি— যে কোনো সময়ে আমি প্রস্তুত।

এছাড়াও কিছু লক্ষণ আমার চোখে পড়েছে। আমি বলবো না যে বাংলা ব্লগস্ফেয়ারে ইসলামোফোবিয়ার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে কিংবা 'মুক্তমনা' নামক ব্লগে নাস্তিকরা ব্যাকটেরিয়ার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরং বেশীরভাগ লেখাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যারা সেখানে লেখেন তারা যে খুব ভালো লেখেন সেটা মনে হয় নি কিন্তু তারা ফ্রি এনকোয়েরির স্পিরিটেই লেখেন। তবে এও সত্য যে কিছু লেখা সত্যিই ইসলামোফোবিক এবং যে লেখাগুলো ইসলামোফোবিক সেগুলোতে কিংবা সেই লেখকরা অন্যত্র উৎকট মাত্রার হেইট স্পীচ দেন (মুক্তমনার কিছু লেখককে মনে হয় দেখেছি যে তারা অন্যত্র সন্দেহাতীত ভাবে ইসলামোফোবিক হেইট স্পীচ দিয়েছেন এবং মুসলমান উগ্রতাবাদীরা অত্যন্ত অন্যায্যভাবে এর দায়ভার অভিজিৎ রায়ের ওপর চাপিয়েছেন)। এর কারণ মনে হয়েছে দুটো: প্রথমটি হোলো তারা নিজেদের যা দাবী করেন সেটি তারা নন অর্থাৎ 'বিজ্ঞানমনস্ক' নন। তারা একজন দেড় হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক চরিত্রকে মূল্যায়ন করেন আজকের পৃথিবীর মাপকাঠিতে এবং সেটিও করেন খুব অল্প পড়ালেখা করে। বাংলাদেশের 'পাইছি' সাংবাদিকতার মতো। একজায়গায় ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনো আর্টিকেল পড়লেন, বাস ওটা ব্যবহার করতেই হবে। বিজ্ঞানমনস্ক হোলে তারা যাচাই বাছাই করে নিজেদের কুসুম কুসুম পাণ্ডিত্য জাহির করা থেকে নিবৃত্ত হতেন। আর দ্বিতীয় কারণটি হোলো আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় কাওকে শুয়োরের বাচ্চা না বললে নিজের ক্ষোভ সুষমভাবে প্রকাশ পেলো না বলেই অনেক লেখক অভিমান করেন।

যেমন ধরুন কা'ব ইবেন আল-আশরাফ নামক এক ইহুদি নেতাকে রসুল ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লেখার জন্য হত্যা করিয়েছিলেন বলে তারা মুহাম্মাদের সমালোচনা করেন। এবং সে ঘটনার সাথে অভিজিৎ রায়ের হত্যার 'ইসলামী' যোগসূত্রের সন্ধান দেন পাঠকদের (অর্থাৎ ফ্যানাটিকরা যে রসুলের বিদ্রূপকারীদের হত্যা করে তার উদাহরণ রসুল নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন)। তারা যে কথাগুলো বলতে কিংবা পড়তে ভুলে যান সেটা

হোলো কা'ব ইবেন আল-আশরাফ বানু নাদির গোত্রের ইহুদি ছিলেন এবং এই গোত্রটি মদিনা সনদের সিগনেটরী। এই চুক্তি মোতাবেক কোনো গোত্র মক্কার কুরাইশদের সাথে প্যাক্ট করতে পারবে না এবং মদিনাবাসীরা কারো দ্বারা আক্রান্ত হোলে সবাই এক সাথে প্রতিহত করবেন।

তা চুক্তি ভঙ্গ হোলে কী হবে? আপনার খারাপ লাগতে পারে কিন্তু সে সময়ের যে আইন তাতে মৃত্যুদণ্ডই যে চুক্তিভঙ্গের সাজা সেটা সবার জানা ছিলো— মদিনার মুসলমান এবং ইহুদি সবাইই এটা জানতেন। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন গোত্রের অংশগ্রহণে যে চুক্তি, তাতে ইসলামী আইন বলবৎ হবে কিংবা আমাল আলামুদ্দিন ও জেফরি রবার্টসনকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হবে। কা'ব ইবেন আল-আশরাফ মক্কার আবু সুফিয়ানের সাথে চক্রান্তের জন্য মিলিত হয়েছিলেন এবং এর শাস্তি তখনকার বিচারে মৃত্যুদণ্ডই ছিলো। তাছাড়া রসুল সে সময়ে কেবল ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না, বিচারক ও প্রশাসকও ছিলেন। তার অথোরিটি ছিলো এই রায় প্রদানের। কোনো সাহাবী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা ইসলামী জজবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করেন নি।

এরপরও যদি আপনার রসুলকে সমালোচনা করার ইচ্ছা হয়, অবশ্যই করুন— কিন্তু তার ভাষাটা শালীন হওয়া উচিত। গালিগালাজ করা, কিংবা এই একটি ঘটনা থেকে ইসলামকে ভায়োলেন্ট বলাটা নেহাৎ 'অবিজ্ঞানমনস্ক' হওয়ার লক্ষণ। ধর্ম বিষয়ে অল্পবিস্তর পড়ালেখায় আমার মনে হয়েছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মই ইনহেরেন্টলি ভায়োলেন্ট না। কিন্তু অনেক মানুষের চরিত্রে একটা প্রকৃতিগত ভায়োলেন্স আছে। তাই সব ধর্মই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারে কিছু ভায়োলেন্ট মানুষের অংশগ্রহণের কারণে। বরং অন্তত কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে ধর্ম হয়তো ভায়োলেন্স কমাতে সাহায্য করে।

আসল বিষয় হোলো সে ধর্মের অনুসারীদের, সংখ্যার দিক থেকে একটা ক্রিটিকাল মাস আছে কি না? জীব হত্যা যে ধর্মে হারাম, সে শান্তির ধর্ম পালনকারী বৌদ্ধরা মায়ানমারে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে।

নাস্তিকতার যখন যথেষ্ট-সংখ্যক অনুসারী হবে, যখন তারা অর্গানাইজড হবে এবং যখন তারা মনে করবে যে আক্রমণ করলে জেতার সম্ভাবনা প্রবল— তখন নাস্তিকরাও ভায়োলেন্ট হবে। ভায়োলেন্স মানুষের খাসলত— এটা ঐতিহাসিক সত্য। ধর্ম একটা অনুঘটক সন্দেহ নাই— কিন্তু আরো অনেক অনুঘটক আছে যেগুলোকে নির্দিষ্ট করার একটা দায়িত্ব আছে, যদি আপনি বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে থাকেন। উদাহরণ দেই—

কারোই জানা নেই অভিজিৎ রায়কে কারা হত্যা করেছে। সন্দেহ করা মোটেও অমূলক না যে কাজটা ধর্মীয় ফ্যানাটিকদের। সেটা ধরে নিলেও আমার জানা মতে এ ধরনের ধর্মীয় কারণে হত্যা এবং হত্যাপ্রচেষ্টা হয়েছে এখন পর্যন্ত মোট চারজনের ওপর: হুমায়ুন আজাদ, থাবা বাবা, আসিফ মহিউদ্দিন এবং অভিজিৎ রায়। ধরে নিই সংখ্যাটা এর দ্বিগুণ (যেহেতু সঠিক সংখ্যাটি আমার জানা নেই)। গত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র বিএনপি করার জন্য কিংবা জামায়েত এবং হেফাজত করার জন্য সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় বিনা বিচারে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে পুলিশ এবং RAB হত্যা করেছে তার চেয়ে অ-নে-ক বেশী মানুষ। এমন কি ছাত্রলীগও তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে এর চেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছে। বিজ্ঞানমনস্ক হোলে আপনার এমপিরিকাল ডেটার ওপর নির্ভর করার কথা। সেক্ষেত্রে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ইসলামকে ইনহেরেন্টলি ভায়োলেন্ট বললে আপনাকে অন্তত এটা মানতে হবে যে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ উভয়ই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের কনটেক্সটে ইসলামের চেয়ে বেশী ভায়োলেন্ট।

দেখুন নিজেকে বিজ্ঞানমনস্ক দাবী করার একটা সমস্যা হোলো আপনাকে সব সময় একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে হবে। সারা রাত ফিফটি শেডস দেখে ভোর বেলায় ফজর নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার মতো না ব্যাপারটা।

তবে এ কথাও সত্য যে শুধুমাত্র আক্রমণের সংখ্যা দিয়ে ধর্মীয় ফ্যানাটিসিজমের মাত্রা মাপা সম্ভব না। বাংলাদেশে ইসলামী ফ্যানাটিসিজম আছে— এটা সত্য এবং আমার কাছে যেটা ভয়ঙ্কর লেগেছে সেটা হোলো বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা নিজেদের ঈমানদার মুসলমান হিসেবে জ্ঞান করে তারাও অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডকে নৈতিকভাবে সমর্থন

করেছে। তারা কয়েকটি সত্য খুব সুবিধাজনকভাবে ভুলে যায় যে রসুল তার বিরোধী পক্ষের মানুষ, যারা দীর্ঘদিন ধরে তাকে যন্ত্রণা করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। এমনটা কল্পনা করা মোটেও অসঙ্গত না যে কুরাইশরা তার অনুপস্থিতিতে তার সাহাবীদের সামনে মুহাম্মাদকে নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলতো। প্রতিক্রিয়ায় তার সাহাবীরা যদি কুরাইশদের হত্যা করার চেষ্টা না করে থাকে এখনকার মুসলমানরা কি সাহাবীদের চাইতেও বড় মুসলমান যে রসুলকে নিয়ে আপত্তিকর কোনো কথা বললেই কাওকে হত্যা করতে হবে বলে তারা মনে করে? এই প্রশ্নগুলো এখনকার মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে।

সিরিয়া আরবদের নিয়ন্ত্রণে আসে রসুলের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কিন্তু সিরিয়ার জনসংখ্যার ৫০% মুসলমান হতে সময় লাগে প্রায় পাঁচশ বছর। সাহাবী এবং তাদের বংশধররা আছে, আছে মুসলমানদের শাসন। তারপরেও মোট জনসংখ্যার অর্ধেককে মুসলমান করতেই লেগে গেছে পাঁচশ বছর (ইসলাম প্রকৃতিগত ভাবে ভায়োলেন্ট হোলে আরো কম সময় লাগা উচিত ছিলো বলে আমার ধারণা)। দেড় হাজার বছর পর আজকের পৃথিবীর এক বিলিয়নের বেশী মানুষ নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করেন। কিন্তু ফ্যানাটিকদের মর্সিয়া শুনলে মনে হয় কাল সকালের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। দেড় হাজার বছর যা টিকে থাকতে পারে সেটা নিজের মেরিটেই টেকে— এটা বোঝার জন্যে আপনাকে আইনস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সে সাথে এটাও সত্য যে সাম্প্রতিক কালে ইসলামী ফ্যানাটিসিজমের যে উৎকট প্রকাশ— সেটা উস্কে দেয়ার পেছনে বাংলাদেশে মুক্তমনের যারা দাবীদার তাদের একটা বড় অংশের খুব বড় দায়ভার আছে।

লাইফ সায়েন্স আমার পেশা। আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে যে আড্ডাবাজি তার একটা বড় অংশ ধর্মের পেছনে ব্যয় হয়। সব ধর্ম নিয়েই আলোচনা হয় কিন্তু আমার দুয়েকজন বন্ধু ছাড়া বাকীদের ধর্মবিশ্বাস যে কী, সেটা নিয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই। সম্ভবত আমার বেশীরভাগ সহকর্মীই নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদী। হ্যা, যারা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে তাদের মূর্খতা নিয়ে আমিও রঙ্গতামাশা করি— সন্দেহ নেই। কিন্তু

কখনোই কোনো ধর্মকে আক্রমণ করার কোনো প্রয়োজন কারো মধ্যে আমি দেখি না।

কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তমনাদের অনেকের মাঝে আমি ইভানজেলিক জজবা দেখতে পাই। যুক্তির কাজ আপনাকে চোক-স্ল্যাম দেয়া না। যুক্তির কাজ হোলো সবচেয়ে অল্প ও সহজ ভাষায় সত্যটাকে উপস্থাপন করা— আপনাকে ঘায়েল করা না। তাই নাস্তিকতা ও ফ্রি এনকোয়ারির একটা দায়বদ্ধতা আছে যে সেটা যেন সংঘবদ্ধ ধর্মের মতো অন্যকে আঘাত না করে। এই চুক্তি বাংলাদেশের মুক্তমনারা মানেন না।

তাদের অনেকগুলো টুপি আছে। কখন তারা বিজ্ঞানমনস্কতার টুপি পরেন, কখন তারা শাহবাগের টুপি পরেন আর কখন যে তারা আওয়ামী লীগের টুপি পরেন সেটা বোঝা মুশকিল। কিন্তু তাদের আবদার হোলো ভিন্ন ভিন্ন টুপি পরার এই ক্রমপর্যায় সকল দর্শককে সব সময় মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ আপনি যখন শাহবাগে গিয়ে ফাঁসি ফাঁসি করবেন কিংবা একটি ফ্যাসিস্ট রেজিমের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেবেন তখন আপনার ভাষ্যমতে যারা আপনার ও আপনার বন্ধুদের মূল শত্রু, তাদেরকে ভুলে যেতে হবে যে আপনিই ইসলামোফোবিক হেইট স্পীচও দিয়েছিলেন।

আপনি যদি মোরাল হাই গ্রাউন্ড দাবী করেন তাহলে আপনাকে কিছু ভ্যালুজকে বিনা শর্তে, সব সময়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সারা পৃথিবীর লিবারেল লেফট মোটা দাগের কয়েকটা বিষয়কে অনতিক্রম্য ধরে নেন। যেমন ধরুন যারা সমাজের একদম দুর্বল ও মার্জিনালাইজড অংশ তাদের পক্ষে আপনি দাঁড়াবেন, সব পক্ষের সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য উচ্চস্বর হবেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভোকাল তো বটেই ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার পরিচয়ও দিতে হবে, ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন— ইত্যাদি। বাংলাদেশে যারা নিজেদের লিবারেল দাবী করে ফ্রি স্পিরিটের চেতনায় পূণ্যস্নান করেন তাদের অনেকেই এই প্রতিটি শর্তের বরখেলাপ করেন হরহামেশা। বাংলাদেশে মাদ্রাসা ছাত্রদের মতো দুর্ভাগা জনগোষ্ঠী খুব বেশী নেই। রাষ্ট্রীয় বাহিনী এদের হত্যা করলে তারা পুলক বোধ করেন। আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করলে তারা তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন। অনেকেই বলেন যে বাংলাদেশে ফাঁসি নিষিদ্ধ হয়ে যাক অসুবিধা নাই, কিন্তু সেটা যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি দেয়ার পরে।

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক সরকার একটি ডাকাতিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে চেয়ার ধরে রাখলে তারা বলেন গণতন্ত্রের আগে উন্নয়ন প্রয়োজন।

এরকম স্ববিরোধিতা নিয়ে মোরাল হাইগ্রাউন্ড দাবী করাটা শুধুমাত্র হাস্যকর হোলে আপত্তি ছিলো না— এটা বিপজ্জনকও বটে। তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ফেমিনিস্ট। তিনি যখন খালেদা জিয়ার ভ্রু আঁকা নিয়ে বিশ্রী ভাষায় কটাক্ষ করেন তখন 'অনারীবাদী' পুরুষেরা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন তোলেন যে এই একই কাজটা আমি করলে কুৎসিত শভিনিস্ট কিন্তু আপনি করলে ঠিক আছে কারণ আপনার ভ্যাজাইনা আছে আর আমার তা নেই। এবং এ জাতীয় কথাভাজা শেষ হয় সাধারণত একটি বাক্য দিয়ে, গুষ্টি মারি এই ফেমিনিজমের। ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের যে কথাগুলো প্রতিটি পুরুষের জন্য শোনা ফরজ ছিলো সে কথাগুলো হারিয়ে যায় নারীবাদীদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এর জন্য।

আমাদের সমাজ যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক কূপমোন্ডুকতায় বিপর্যস্ত সেটা কোনো খবর না। বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা সত্যিই পারে আমাদের সমাজের চিন্তার মুক্তি ঘটাতে (চিন্তার মুক্তি মানে আপনাকে আঘাত করে কোনো প্রত্যাঘাতের ইমিউনিটি না)। সে নিরিখে আমাদের দেশে প্রয়োজন আছে মুক্তমনা'র মতো ব্লগের। কিন্তু সেই চেষ্টা মাঠে মারা যাবে যদি আপনি যাদের কাছে টানতে চান তাদেরকেই খোঁচানো শুরু করেন সবার আগে। তর্কে জেতাকে আপনি শিরোপা মনে করেন, তার জন্য ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে আপনার আগ্রহ। যাকে আপনি আপনার দলে নিতে চান তাকেই আপনি শত্রু বানাতে চান সবার আগে। অল্প বুদ্ধি ও বেশী জজবার এটাই হোলো কুইনটেসেনশিয়াল লক্ষণ।

যারা মুক্তচিন্তার পক্ষের মানুষ তারা মুসলমানদের নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে— এমন কি ইসলামকে নিয়ে ন্যায্য সমালোচনা করলেও কি ধর্মীয় ফ্যানাটিকরা উন্মত্ত হয়ে উঠবে না? এমন কি হয় নি বাংলাদেশে? প্রশ্নটা ন্যায্য এবং এই প্রশ্নের সদুত্তর দেয়া প্রয়োজন। হ্যা, বাংলাদেশে ইসলামী ফ্যানাটিসিজম আছে এবং হ্যা, তারা বহু ন্যায্য প্রশ্নেরও উৎকট প্রতিক্রিয়া দেখান। এ কথার বিরোধিতা হয় না।

এর একটা বড় কারণ সম্ভবত আপনি নিজে— সৎভাবে প্রশ্ন করুন। দাড়িটুপিওয়ালারা সম্ভবত মানুষ হিসেবে আপনাকে কনফিডেন্সে নেয় না কারণ রাজাকারের প্রসঙ্গ আসলেই আপনি একটা দাড়িটুপিওয়ালা ব্যক্তিকে দাঁড় করান— যদিও ফোটোগ্রাফিক এভিডেন্স বলছে, রাজাকারদের বেশীরভাগই দাড়িটুপি পরতো না। এতিম বাচ্চাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তো প্রাইভেট এতিমখানার না— রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব পালনে আপনি তো বাধ্য করানই না বরং রাষ্ট্র এই মার্জিনালাইজড এতিমদের বিপক্ষে গেলে আপনি তালি দেন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব যে মাদ্রাসাগুলো পালন করে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে সেজন্য তাদের কোনোদিনও সামান্য ধন্যবাদ দেন নি। আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু একটি অবৈধ অত্যাচারী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করলে আপনি বলেন যে গণতন্ত্রের আগে উন্নয়ন প্রয়োজন। যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন, দেখবেন যে আসল সমস্যা এটা না যে তারা আপনার মতো না— বরং আপনি নিজে যা দাবী করেন সেটা আপনি নন। শুনলে আশ্চর্য হবেন এই দাড়িটুপিওয়ালাদের একটা বিশাল অংশের কাছে নোম চমস্কি একজন ইন্টেলেকচুয়াল হিরো। দেশের বাইরেও, শিক্ষিত দাড়িটুপিওয়ালারা পলিটিকালি, ভীষণভাবে লেফট-লীনিং। কৈ, চমস্কির নাস্তিকতা আর বিজ্ঞানমনস্কতা তো তার মুসলমানদের হিরো হওয়াতে কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। সম্ভবত এজন্যে যে চমস্কি প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে গিয়ে সত্যের পক্ষে দাঁড়ান। সম্ভবত তার উচ্চ নৈতিকতা ও সেই স্ট্যান্ডার্ড এর ওপর অবিচল আস্থা মুসলমানরা লক্ষ্য করে। এই শক্তি যদি আপনার থাকতো, আপনার বন্ধুদের থাকতো— তাহলে দাড়িটুপিওয়ালারাও আপনার সাথেই থাকতো।

একটা প্রশ্ন আপনার নিজেকে করা খুবই প্রয়োজন। আপনি নিজে কোন পক্ষের মানুষ? আপনার কার্যকলাপ কি ফ্যানাটিসিজম উস্কে দেয় না নিবারণ করে। যদি ফ্যানাটিসিজম উস্কে দেয় তাহলে তো আপনার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। আপনার কি সত্যিই প্রয়োজন আছে আঘাত করার? কেন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে যুক্তির নিজস্ব যে শক্তি সেটাই যথেষ্ট অন্ধবিশ্বাসকে মোকাবেলা করার জন্য। ডারউইনের তো প্রয়োজন

হয় নি খোদাতালা নেই— এই দাবী করার। তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট ছিলো বিবর্তনবাদ প্রমাণ করার জন্য।

যে কেউ দশটা ইসলামিক ইতিহাসের বই পড়ে মুসলমানদের ইতিহাসের, তাদের সমাজের, তাদের রাজনীতির সমালোচনা করে একটা খাসা বই বাংলায় লিখে ফেলতে পারেন, কিংবা মুসলমানদের কিছু ঐতিহাসিক প্রিয় চরিত্রের সমালোচনা করতে পারেন। এর মধ্যে কোনো কেরদানি নাই; দুঃখিত। কঠিন কাজ হোলো আজকের সমস্যাকে আজকে মোকাবেলা করা, আজকের রসদ দিয়ে। এই দিক থেকে চিন্তা করলেই বুঝবেন যে আমাদের আসল সমস্যা ধর্মতাত্ত্বিক না। আমাদের দেশের মানুষেরা এখনও শিক্ষার অভাবে চিন্তা করতে শেখে নি। আপনি যদি বলতে থাকেন যে তুই ব্যাটা মুসলমান বলে চিন্তাই করতে পারোস না, তাহলে আপনার জিঘাংসা মিটবে একটু বটে কিন্তু সে তার নিজের কমফোর্ট জোনে আরো বেশী করে খাবি খাবে। তাকে আপনি আরো বেশী উগ্র হতে সাহায্য করবেন।

আপনি যদি তাকে বলেন যে আপনার মেটাফিজিকাল দুনিয়া নিয়ে আমার কোনো কথা নেই এবং সেটা নিয়ে আপনি আপনার মতো থাকেন। কিন্তু এই ফিজিকাল দুনিয়ায় বিজ্ঞান ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই তাহলে সে হয়তো আপনার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যদি বলেন যে আপনার ধর্ম আপনি মনোযোগ দিয়ে পালন করুন কিন্তু আমার কথাটা শুনুন কারণ বিজ্ঞান আর যুক্তি ছাড়া এই পৃথিবীতে সফল হওয়া কঠিন— তাহলে বলা যায় না সে একদিন হয়তো ধর্ম বিষয়েও আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বিবর্তনবাদ খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিবর্তনবাদ ছাড়া কোনোভাবেই আপনি বায়োলজি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না— প্রত্যেকেরই সেটা বুঝতে হবে। আপনি নিজে বিবর্তনবাদের আধুনিক প্রসঙ্গগুলো বোঝেন না ঠিকমতোন কিন্তু অন্যকে বোঝাতে হবে আপনি এর ওস্তাদ। তাই বিবর্তনবাদকে এমনভাবে হাজির করেন যেন এর একমাত্র উপযোগিতা হোলো খোদাতালা যে নেই আর আদম-হাওয়া বলে কেউ আসে নি— এই দুটো কথা প্রমাণ করা। একবারও বোঝার চেষ্টা করেন না যে আপনি যদি বলতেন যে— খোদাতালা আছে কি নেই এ নিয়ে আপনি আপনার মতো করে সিদ্ধান্ত নেবেন কিন্তু এই

হচ্ছে বিবর্তনবাদ— তাহলে আপনার শ্রোতা লাইফ সায়েন্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই তত্ত্বটিকে অন্তত মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আপনি যদি তার ধর্ম বিশ্বাসের সাথে বিবর্তনবাদের বোঝাপড়ার দায়িত্ব তার ওপরেই ছেড়ে দিতেন তাহলে অন্তত একটা সৎ চেষ্টা করতো বিবর্তনবাদ কী এটা জানার জন্য। সে হয়তো উপলব্ধি করতো যে পুরো লাইফ সায়েন্স দাঁড়িয়ে আছে বিবর্তনবাদের ওপর এবং এটা কোনো হাইপোথিসিস না, প্রমাণিত সত্য। এই গুরুত্বপূর্ণ মেসেজটা তাকে পৌঁছাতে না পারার পেছনে আপনি নিজে যে একটা বড় প্রতিবন্ধক সেটা আপনি স্বীকার করতে রাজি নন কারণ আপনার কাছে বিবর্তনবাদ হচ্ছে আপনার দার্শনিক অবস্থানকে বৈজ্ঞানিক অবস্থান বলে প্রমাণ করার একটা কৌশল মাত্র।

সম্ভবত আপনার বদ্ধমূল ধারণা যে মৌলবাদীদের 'শেষ' করে দিতে হবে। তাদের পরাস্ত না করতে পারলে আপনার বিজ্ঞানমনস্কতা সমাজে শেকড় গাড়বে না। এই যদি হয় আপনার সিদ্ধান্ত, বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার কাণ্ডজ্ঞানের ঘাটতি আছে। নাহ, 'তাদেরকে' আপনি শেষ করতে পারবেন না। কারণ তাদের একটা ক্রিটিকাল মাস আছে যেটা আপনাদের নেই। হ্যা বদলাতে আপনি পারবেন যদি আপনি নিজেকে বদলাতে সম্মত হন। যদি আপনি তার বিশ্বাসকে সম্মান করে সহবস্থানে রাজী হন তাহলে, যদি আপনি আপনার অটল নৈতিকতায় বিশ্বাস রেখে একটা হাত বাড়াতে সম্মত হন, তাহলে সেও আপনার বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ করে উপকৃত হবে। বলা যায় না অনেকে আপনার মতো হওয়ারও চেষ্টা করতে পারে।

এজন্যেই কি আপনি লেখালিখি শুরু করেন নি?

২০১৫

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যৎ

ধরা যাক ২০2০ কিংবা ২০২৫— খালেদা-হাসিনা দুজনই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন— তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হবে? ইসলামিস্টরা কি তৃতীয় শক্তি হবে? জামাত কি ইসলামিস্টদের নেতৃত্ব দেবে না নতুন কোনো দল ইসলামিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করবে? ইসলামিস্টরা কি বিএনপি-লীগ থেকেও শক্তিশালী হয়ে যাবে তখন?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ডিপ্লোম্যাটরা রাজনীতিবিদদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, চিন্তিত নাগরিকরা করেন সাংবাদিকদের। বহু মানুষের সাথে আমিও বারবার আলোচনা করেছি এ প্রসঙ্গে। আমার বন্ধু যারা মেধা, শিক্ষা ও পেশা— সব দিক থেকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাদের সাথে আলাপচারিতাতেও এই প্রসঙ্গটি বারবার ফিরে আসে। মনে হোলো আমাদের আজকের ভাবনাগুলো লিখে রাখা খুব দরকার, ৩০ বছর পর এই সময়টাকে আমরা কীভাবে দেখছিলাম সেটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে।

প্রথমেই কিছু শব্দের সীমানা নির্ধারণ করি, এটা জরুরী, ভবিষ্যতে এই শব্দগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বদলে যাবে।

আমি 'ইসলামিস্ট' বলতে বোঝাচ্ছি তাদের যারা পলিটিকাল ইসলামে বিশ্বাস করেন এবং সে মতে রাজনীতি ও এক্টিভিজম করেন। পাঁচ বেলা মসজিদে যাওয়ার মানে ইসলামিস্ট তো নয়ই, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি করা ও ইসলামিস্ট হওয়ার একমাত্র শর্ত না। এটা একটা আমব্রেলা টার্ম এবং আমি সেই হিসাবেই ব্যবহার করেছি। ইসলামাইজেশান বলতে আমি অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসা বলছি না

এই লেখায়। শুধুমাত্র এই লেখার জন্য ইসলামাইজেশান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মুসলমানদেরই ইসলাম ধর্মের নতুন উদ্বোধন হওয়া অর্থে। এই ঘটনাটির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নির্ণায়ক শব্দ খুঁজে পাই নি দেখে এই ধারকর্জ। 'সেনট্রিস্ট' বলতে আমি বুঝিয়েছি সে সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা মানুষের কথা যারা সব দলের সহাবস্থানে বিশ্বাস করেন, বাস্তবতা ও যুক্তি-তর্ককে চেতনা ও আদর্শের ওপরে স্থান দেন এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে উগ্রবাদী নন। আমার অভিজ্ঞতা বলে বাংলাদেশে সঠিক অর্থে সেনট্রিস্ট দল না থাকলেও বিএনপি অন্য দুটি মূল থেকে চরিত্রে বেশী সেনট্রিস্ট এবং সব দলেই সেনট্রিস্ট প্রবণতার লোকজন আছে। যারাই শাহবাগে গেছে তারাই শাহবাগী– এই অর্থে আমি 'শাহবাগী' বলছি না। আমার কাছে (এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত) আওয়ামী লীগের কাছে যখন টাকা থাকে তখন সেটা স্পিরিচুয়াল প্রজেক্টে পরিণত হয়, কোনো রাজনৈতিক দল থাকে না। শাহবাগী বলতে আমি বুঝি এই স্পিরিচুয়াল প্রজেক্টের ফুট সোলজারদের। লক্ষ্যণীয় হোলো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়েও আপনি এই স্পিরিচুয়াল প্রজেক্টের ফুট সোলজার হতে পারবেন।

সবার আগে আমার জীবনের ছোট্ট একটা পর্যবেক্ষণ

৮৭-৯০ সালের কথা মনে করছি। আমি তখন ছোটো কিন্তু বড়দের কিছু কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার বাবা যেহেতু ৫০ এর দশকে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন, তার বন্ধুরা প্রায়ই কে চীফ অফ স্টাফ হবে এ বিষয়ে খুব আলোচনা করতেন (তখনও তাদের সমসাময়িকরা কেউ কেউ চাকরি করছিলেন)– এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল (তখনও তিনি চীফ হন নি) প্রসঙ্গে তাদের কেউ কেউ মনে করতেন যে জামাল কোনোভাবেই চীফ হতে পারবে না কারণ– সহজ বাংলায় তিনি হুজুর এবং তার স্ত্রী হেজাবী।

২৫ বছর ফাস্ট ফরওয়ার্ড।

আজকে বাংলাদেশে শুধুমাত্র 'হুজুর' হওয়ার কারণে উপরের দিকে ওঠাটা মনে হয় অতোটা কঠিন না কারণ 'হুজুর' ও হেজাবীদের এখন যথেষ্ট

ভিজিবিলিটি আছে সমাজের সব স্তরে। আমাদের ছোটোবেলায় এর ধারে কাছেও কিছু দেখি নি।

অন্যদিকে, এখন যতো স্লীভলেস কামিজ ও ব্লাউজ দেখা যায় সামাজিক অনুষ্ঠানে, তার ধারে কাছেও কিছু আমরা দেখি নি ছোটোবেলায়। মজার ব্যাপার হোলো আপার মিডলক্লাসে স্লীভলেস কামিজ ও ব্লাউজ কিংবা কোনিকাল ব্রা পরাটা আমাদের জন্মের আগে মানে ৬০ ও ৭০ এর দশকে বাংলাদেশের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো (হোলিক্রস স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা CD বানানো হয়েছিলো বেশ কিছু বছর আগে। সে সময়ের ফোটোগ্রাফ দেখলে এর সত্যতা খুঁজে পাবেন)।

আবার

৮০'র দশকে আমাদের মা'দের যে বয়স ছিলো এখন আমাদের স্ত্রীদের সেই বয়স। তখন দেখতাম তারা প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে মিলাদ করতেন এবং আমার খেয়াল আছে এই মিলাদে আসতেন একদম উঁচু তলার স্ত্রীরাও। এটাকে তাদের সময়ের হ্যাং আউট বলবেন কি না আপনার ইচ্ছা; কিন্তু আমার মনে হয় তখনকার অহিজাবীরা এখনকার অহিজাবীদের চেয়ে বেশী ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতেন।

যারা ঢাকায় বড় হয়েছেন তারা কম বেশী আমার এই পর্যবেক্ষণগুলোয় সায় দেবেন বলে আমার অনুমান। আপনি যদি এই সব বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে 'একটা' প্যাটার্ন বের করতে চান কিংবা সামাজিক পর্যবেক্ষণ থেকে রাজনৈতিক উপসংহারে আসতে চান, আপনি ভুল করবেন। এই সোশাল এভোলিউশানের কোনো সহজ ব্যাখ্যা নেই। তবে এরিক হবসম ঠিক কাছাকাছি একটা প্যাটার্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন শিল্প-বিপ্লবোত্তর ব্রিটেনে— যেখানে নতুন পুঁজি সৃষ্টির সাথে সাথে বিপুল ভাবে বেড়েছিলো ধর্মীয় এক্টিভিটি। একদল 'উচ্ছন্নে' যাচ্ছিলো আরেক দল ক্রিশ্চিয়ানিটির ব্যাপক প্রসারকেই মনে করেছিলো এ রোগের দাওয়াই।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে উল্লিখিত জটিলতা হোলো সমাজ পর্যায়ের। এর উপর যোগ করেন রাজনৈতিক জটিলতা— এমন কঠিন এক জিগস পাজল তৈরি হবে যার কোনো সমাধান নেই। এবং সমস্যা হোলো এমন

অবস্থায় আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করবেন, খুব সহজেই সেই মাফিক একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। যেমন শাহবাগীরা মনে করে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে দেশ পুরা আফগানিস্তান হয়ে যাবে। আবার বিএনপির লোকেরা মনে করে যে বাংলাদেশে ঐ রকম র‍্যাডিকাল ইসলামাইজেশানের কোনো সম্ভাবনাই নেই, বরং উদ্ধত সেকুলারিজমই সবচেয়ে বড় সমস্যা। মোদ্দা কথা আপনার নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন, সেই অনুযায়ী এবং অনুপাতে একটি ভয়াবহ ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।

প্রথম প্রশ্ন হোলো বাংলাদেশে গত ২৫-৩০ বছরে বিশেষ করে শেষ ১৫ বছরে এতো দ্রুত ইসলামাইজেশান হোলো কেন?

আমার পরিচিত এক বাংলাদেশী ক্যানবেরান যিনি বাংলাদেশে ৮৪ সালে গ্রামে শিক্ষকতা করেছেন; তার অভিজ্ঞতা হোলো তখন গ্রামে দশ জনের মধ্যে বড়জোর এক জন হিজাব করতো আর এখন সেই একই স্কুলে দশ জনের মধ্যে আট জন হিজাব করে কিন্তু এখন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই 'দুই নম্বর' কিন্তু ৮৪ সালে প্রতিটি মেয়েই সহজ সরল ছিলো। তার ধারণা এর মূল কারণ হোলো এনজিও— সহজ কথায় মিডল ইস্টের টাকা।

তিনি যে ডেমোগ্রাফির কথা বলছেন সেখানে মিডল ইস্ট ও জামাতের টাকা ইসলামাইজেশানের কাজে এসেছে এ কথা সত্য (তবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে না) কিন্তু সমস্যা হোলো তিনি ধর্মকে একটা প্রডাক্ট হিসেবে জ্ঞান করছেন অর্থাৎ যতো বেশী টাকা (= মাইলেজ = ইনভেস্টমেন্ট), ততো বেশী ইসলামাইজেশান। সোশাল এভোলিউশানের এরকম শুধু টাকা-ভিত্তিক ব্যাখ্যা একেবারেই খাটে না।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় খুঁত হোলো— যে ইসলামাইজেশানের জন্য এখন মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির উত্থান হতে চলেছে অর্থাৎ শহুরে অনূর্ধ্ব ৪০ জনগোষ্ঠির মাঝে ইসলামের প্রসার— সেখানে এই অয়েল মানি প্রায় কোনো কাজেই আসে নি।

আমি দেখেছি যে অসংখ্য তরুণ-তরুণী যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্ত ঘরের সন্তান এবং শহরের নাম করা স্কুল কলেজ থেকে পাশ করে পেশার দিক থেকে খুবই সফল— এরাও ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে

উঠছে যেটা ৮০'র দশকে আমার ছেলেবেলায় প্রায় কখনোই দেখা যেতো না। আমার এক বন্ধু টেলিভিশনের মডেলিং বাদ দিয়ে, দাড়ি রাখা উঁচু বেতনের এগজিকিউটিভ হয়ে গেছে। আমাদের আরেক বন্ধু আইবিএ থেকে পাশ করে এখন আরবী শেখায়। এবং এই পরিবর্তন একটা দুটা না, হাজারে হাজারে।

এই ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো?

প্রথমে আমার একটা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা: আমরা স্কুল কলেজের বই-পুস্তকে যা পড়ি, বিস্ময়কর হোলেও সত্য যে বাস্তব জীবনে কেবল ইসলাম ধর্ম শিক্ষাই প্রাসঙ্গিক। বাংলা বইয়ে যে ভাষা শিখি সে বাংলাতে কেউই কথা বলে না, এমন কি টিভিতেও এখন আর তেমন শোনা যায় না। যে ইংরেজি, বইয়ে থাকে সে ইংরেজি কোনোদিনও কোনো দেশে চর্চা হতো কি না আমার সন্দেহ— দশ বছরের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নির্ভুল বালকদের আজগুবি সব কেচ্ছা-কাহিনীতে ভরা। অঙ্ক আর বিজ্ঞানে শিখি যে দুই আর দুই চার— বাস্তব জীবনে এই যোগফল পাঁচ, ছয় এমন কি পাঁচশও হতে পারে। বিজ্ঞানের প্রায় কোনোই ব্যবহার নেই দৈনন্দিন জীবনে (বিজ্ঞান ব্যবহার করা আর অন্যের বানানো টেকনোলজি এস্তেমাল করা এক জিনিস না)। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষায় বলছে সমর্পণ করো, শান্তি পাবে। বাস্তবে কী হয় এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব অল্প কিন্তু যারা ইসলামের প্রতি অনুরক্ত তারা বলে যে ধর্ম-শিক্ষা বই যা প্রমিজ করে তা ডেলিভারও করে, নিজেদেরকে সমর্পণ করে তারা শান্তির খোঁজ পেয়েছেন।

আমাদের কালে, আমি বলবো মোটামুটি মিড নাইনটিজ থেকেই বিশ্বব্যাপী একটা ঘটনা ঘটেছে আর সেটা হোলো আমাদের জীবনে এখন আর কোনো কার্যকর ফিলোসফি নেই, নেই কোনো সামষ্টিক ট্র্যানসেনডেন্ট ট্রুথ। মানুষ এমন একটা প্রাণী যে নিজের জীবনের পরিপূর্ণতা দেখার জন্য অন্যের জীবনে কোনো একটা ফিলোসফির বাস্তবায়ন দেখতে চায়। আমাদের দেশে ৬০ থেকে নিয়ে ৮০ এর দশক পর্যন্ত সোশালিজমের মধ্যে দিয়ে তরুণরা দর্শনের খিদেটা মিটিয়েছে। নানা কারণে নাইনটিজে এসে এই বন্দোবস্ত বদলে যায়। সভিয়েট য়ুনিয়েনের পতন, বাংলাদেশী

বামদের আদর্শিক স্খলন, বিশ্বব্যাপী বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া— সবই এর পেছনে কম বেশী কাজ করেছে।

আমাদের কালে এই দেশে দর্শনের অভাব কিছুটা মিটিয়েছে ইসলাম— অন্তত কিছু মানুষের জীবনে। এর একটা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হোলো পলিটিকাল ইসলামের প্রতি আকর্ষণ-বোধ। ইসলাম ধর্মটা একটু বিচিত্র এই বাবদে। দশ জন লোক যদি ইসলামী অনুশাসনে মনোযোগী হয়ে ওঠে দেখা যাবে যে পাঁচজনই সামগ্রিক মুক্তির জন্য পলিটিকাল ইসলামকে আবশ্যক মনে করে— এই ব্যাপারটা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য না। বলাই বাহুল্য এই পাঁচজন যদি হয় শিক্ষিত তরুণ তাহলে ধীরে ধীরে দেখা যাবে যে কোনো একটা ইসলামী পলিটিকাল আইডিয়োলজি গ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হচ্ছে।

শাহবাগী এবং আওয়ামী মনোভাব সম্পন্ন মানুষেরা এই ব্যাপারটার দুটো ভুল ব্যাখ্যা করে। প্রথমটা হোলো যে তারা মনে করে যে এই তরুণেরা অধিকাংশই জামাতী। ইন ফ্যাক্ট এই যে নতুন আরবান ইসলামিস্ট ক্লাস, তাদের পলিটিকাল আইডেনটিটির দুটো মূল প্রতিপাদ্য হোলো জামাতকে অপছন্দ করা এবং কওমী মাদ্রাসা তথা হিফাজতকে একটু তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা এবং এর মধ্যে দিয়ে উভয়ের থেকেই আলাদা হওয়ার চেষ্টা করা। তার মানে কিন্তু আবার এই না যে বিএনপি-আওয়ামী লীগের মতো দা-কুমড়া সম্পর্ক। বলা যেতে পারে এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাড কিন্তু পরস্পরের সাথে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক একাত্মতা ঘোষণা না করার জন্য যথেষ্ট। ভিকারুন্নিসা স্কুল থেকে পাশ করা বালিকারা যেমন করে ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের দেখে অনেকটা সেরকম।

কিন্তু এই ভুলটা ততোটা মারাত্মক না যতোটা দ্বিতীয়টি। শাহবাগী, আওয়ামী, সেনট্রিস্ট, বিএনপি, সুশীল, ডিজুস— মানে আরবান ক্লাসের বিশাল একটা অংশ মনে করে যে এই ইসলামিস্টরা আন্ডার-এচিভার।

বাংলাদেশে ৬০ ও ৭০ এর দশকে সবচেয়ে মেধাবীরা বাম রাজনীতি করতো, এখনকার বাংলাদেশে সবচেয়ে মেধাবীরা রাজনীতি-বিমুখ বললে কম হবে, ঘৃণাই করে। কিন্তু যারা রাজনীতি করে (অর্থাৎ সশরীরে এক্টিভিজম করেন, দল করেন, সংগঠিত হন— ফেসবুকে না শুধু), তাদের

মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও পড়াশোনা জানা ছেলে-মেয়েরা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ধারায় হয় ইসলামিস্ট, নয়তো বাম ধারার (কিন্তু বাম ধারার সংখ্যাটা খুবই কম)।

আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার হোলো সারা পৃথিবীতে যারা নিজেদের প্রোগ্রেসিভ ঘরানার রাজনীতি করেন বলে দাবী করেন তারা অনেক বেশী সহনশীল হন আর ইসলামিস্টরা হয় অসহনশীল। বাংলাদেশে হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টা। এখানে যে নিজেকে লিবার্টিন বলে দাবী করে, সে আবার ফাঁসিও চায়। একদিকে সে নিজেকে সেকুলার বলছে অন্য দিকে 'প্রয়োজনে লাখ খানেক মানুষকে হত্যা' করার পরামর্শও দিচ্ছে। এবং সব সময় সে রেগে থাকে— মানে ভয়ঙ্কর ধরনের রাগ। পরমতসহিষ্ণুতার দিক থেকে বাংলাদেশের তথাকথিত প্রোগ্রেসিভ ক্লাস এতোটাই প্রতিক্রিয়াশীল যে 'সভ্য মত বিনিময়' মোটামুটি অসম্ভব হয়ে যায়।

আশ্চর্য ব্যাপার হোলো ইসলামিস্টরা অপেক্ষাকৃত বেশী সহনশীল। তাদের সাথে অন্তত কিছু সময় আপনি গালিগালাজ ছাড়া তর্ক করতে পারবেন (নিতান্তই আমার পর্যবেক্ষণ)।

কথা হোলো, আসল কথা হোলো— এই ইসলামিস্টরা কি সংগঠিত হতে পারবে এবং হোলেও তারা কোন ধরনের ইসলামিস্ট হবে?

প্রথমত: একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশের ইসলামিস্টরা চরিত্রে টার্কিশ ইসলামিস্টদের কাছাকাছি, তালেবানদের মতো না কারণ ইসলামিস্ট নেতা এবং নেতৃস্থানীয়দের বিরাট অংশ আদতে অন্টাপ্রেনিওর— সহজ ভাষায় তাদের কাছে টাকা আছে এবং তারা ইসলাম না বুঝলেও ব্যবসাটা ভালো বোঝেন। সুদূর ভবিষ্যতে তারা যদি কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারে— যে একটি পেশার মানুষ তাদের ব্যাপারে সব চেয়ে খুশী থাকবে বলে আমার অনুমান— তারা হোলো ব্যবসায়ী শ্রেণী— কারণ বাংলাদেশের ইসলামিস্টরা প্রচণ্ড ব্যবসা-বান্ধব।

কিন্তু ক্ষমতায় যেতে হোলে যে পরিমাণ সংহতি ও পরিপক্কতা দেখাতে হবে তা কি তারা পারবে?

সম্ভবত না।

বাংলাদেশের ইসলামিস্টরা বাঙালি ইসলামিস্টও বটে— অনর্থক তর্কে তাদের অনন্ত অনুরাগ। নিজেদের মধ্যে কারা শুদ্ধতম ইসলামের অনুসারী— এ আলোচনার ক্ষুধা তাদের কেয়ামতের পরেও বলবৎ থাকবে। এটাকে মুসলমানদের কুইনটাসেনশিয়াল বৈশিষ্ট্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু

শাহবাগীরা মনে করেন বিএনপির যে বিশাল জনসমর্থন আছে দেশব্যাপী তারা খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে ইসলামিস্ট হয়ে উঠবে। এর কারণ হিসেবে তারা যা মনে করেন তা হোলো বিএনপি আদর্শিক ভিত্তি দুর্বল পক্ষান্তরে ইসলাম একটি ১৪ শ বছরের পুরনো আদর্শ। বিএনপি টিকে আছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের কারণে। তার মৃত্যুর পর এন্টি-আওয়ামী লীগ সেন্টিমেন্টের জন্য বেটার আউটলেট হয়ে যাবে ইসলাম এবং বিএনপি ছেড়ে সবাই ইসলামপন্থীই হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেনট্রিস্টরা ক্রমশ এক্সট্রিমিস্ট হয়ে উঠবে। মোটামুটি কাছাকাছি ধারণা কিছু কিছু বিএনপিপন্থীদের মাঝেও আমি দেখেছি।

প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিএনপির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে যিনি মোটামুটি পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতি দেখেছেন কাছে থেকে এবং যার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর আস্থা রাখা যায়। তিনি বললেন আর সব কিছু যদি মেনেও নেই, ইসলামিস্টদের নেতৃত্বটা দেবে কে? বাংলাদেশে অর্গানিক রাজনীতি হয় না। লীডারশিপ ছাড়া বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল কোনোদিনও বেড়ে উঠতে পারবে না। তার মতে ইসলামিস্টদের মধ্যে জামাত ছাড়া অন্য কোনো অংশ 'রাজনীতি' 'বোঝে' না এবং জামাতেরও যে একজনমাত্র নেতাকে তার মনে হয়েছে যে পরিবর্তিত পৃথিবীতে ইসলাম-পন্থী দলের ভূমিকা কী হবে এটা বোঝার মতো প্রয়োজনীয় সফিস্টিকেশান ও দূরদৃষ্টি আছে— তিনিও জেলে এবং সম্ভবত তার ফাঁসি হবে।

কিন্তু যদি এমন হয়—

খালেদা-হাসিনার পর বাংলাদেশে অন্তত আওয়ামী লীগ-বিএনপির কোনো নেতা কোনোদিনও এ পরিমাণ ক্ষমতা সংহত করতে পারবেন না— সেটা জানা কথা। সে ফাঁকে ইসলামিস্টরা যদি একটা ইমরান খান খুঁজে পায়। পশ্চিম-ফেরত, ইংরেজিতে বক্তৃতা দেয়, ক্লীন-শেভড, মিল্টন ফ্রিডম্যান কোট করে আবার কোরানের আয়াতও শুদ্ধ আরবীতে উচ্চারণ করে মেঠো বক্তৃতায়। অন্তত বিএনপি-আওয়ামী লীগের চেয়ে ইসলামিস্টরা যে গভর্নেন্সের দিক থেকে সফল হবে এ ব্যাপারে বেশীরভাগ লোক একমত হবেন। বিভিন্ন দলের সেনট্রিস্টরা যদি ইসলামের পতাকাতলে চলে এসে?

আমি এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিই না। কিন্তু আমার ধারণা ইসলামিস্টরা সফল হবেন না। কেন?

সমস্যাটা ইসলাম নিজে। লিবারেল আইডিয়োলজির একটা সুবিধা আছে যেটা ইসলামের নেই। ব্যক্তিগত প্রশ্ন আসলেই লিবারেল আইডিয়োলজি বলতে পারে— এটা বাপু তোমার সমস্যা, ডু ওয়াটএভার য়ু লাইক। আপনি মদ খাবেন না স্লীভলেস কামিজ পরবেন এটা আপনার নিজের ব্যাপার— এখানে আমার কিছু করার নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম বাই ডেফিনিশন একটা ধর্ম, তাকে রিএক্ট করতে হয়, দর্শকের ভুমিকা নিতে পারে না। ইসলাম বলতে পারে না ডু ওয়াটএভার য়ু লাইক, এটা আমার সমস্যা না। রাষ্ট্র চালাতে গেলে 'এটা আমার সমস্যা না' বলতে পারাটা খুব জরুরী, যেটা ইসলাম পারে না।

ইসলাম একটা ধর্ম কিন্তু রাষ্ট্র একটা পলিটিকাল কনস্ট্রাক্ট। দিন শেষে বাস্তবতা হোলো য়োরোপীয়ান এনলাইটেনমেন্টের ফলাফল যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা কারী মতবাদ হিসেবে পলিটিকাল ইসলাম কমপ্যাটিবল না। রাষ্ট্রের দার্শনিক গন্তব্য হোলো ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ইসলামের দার্শনিক গন্তব্য হোলো সমর্পনের মাধ্যমে অর্জিত শান্তি। প্রশ্নটা ইসলাম ভালো না লিবারেল ডেমোক্রাসি ভালো— তা না; বরং এটা কমপ্যাটিবিলিটির ইসু— 'রাষ্ট্রব্যবস্থার' সাথে ইসলাম যায় কি না?

আমাদের দেশে পলিটিকাল ইসলামের প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করতে হোলেও কয়েকটা মৌলিক প্রশ্নের সুরাহা করতে হবে। সারা পৃথিবীর ইসলামিস্টদেরই বোধ করি করতে হবে।

এগুলো কী?

পলিটিকাল ইসলামের দিক নির্দেশনা প্রত্যক্ষভাবে কোরানে নেই (যেমন আপনার নেতাকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করা হবে কি না)। কিন্তু মুসলমানের ব্যক্তিজীবন কেমন হবে— এর অতি খুটিনাটি ব্যাখ্যাও কোরানে আছে। পলিটিকাল ইসলামকে রাষ্ট্র-পরিচালনাকারী মতবাদ হিসেবে যারা দেখতে চান তাদের এমন কিছু বিষয়ে আপস করতে হবে যার নির্দেশনা কোরানে আছে। যেমন ধরুন ইসলামিস্টদের বাংলাদেশে হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কি না। পোষাক পরিধানে ইসলামের কিছু বাধ্য-বাধকতা আছে, এর মাঝে কোনো যদি কিন্তু নেই; কিন্তু অনেক মুসলমান ছেলেমেয়েই আছে যারা এই বাধ্য-বাধকতা মানেন না কিংবা মানতে চান না। আমার সময়ে ইসলামিস্টরা চোখ বুজে থাকতে পারেন কেননা তারা বলতে পারেন যে ভাই এটা তো আমাদের মাথা-ব্যথা না কারণ আমাদের কাছে ক্ষমতা নেই। যখন ক্ষমতা আসবে তখন কিন্তু তারা দর্শক হয়ে থাকতে পারবেন না, পক্ষ নিতে হবে। রাষ্ট্র পর্যায়ে ইসলামের বাস্তবায়ন করার জন্য (যার সরাসরি নির্দেশনা নেই কোরানে), তারা কি ব্যক্তি পর্যায়ের ইসলামের সাথে আপস করার মতো (যার সরাসরি নির্দেশনা আছে কোরানে) সাহস দেখাতে পারবেন?

আমার ধারণা বিশ্বব্যাপী এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপের জন্য যে ধরনের কনসেনসাস প্রয়োজন, ইসলামিস্টরা তার ধারে কাছেও আসতে পারে নি। মুসলমানরা ১৪শ বছর ধরে তর্ক করে তাদের নেতা কীভাবে বেছে নেয়া হবে এইটুকু মতৈক্যে পৌঁছায় নি। বাঙালি মুসলমান তো আরেক কাঠি সরেস। সে তর্কপ্রিয় এবং শিশুতোষ তর্কে তার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী (অর্থনীতির নোবেল প্রাইজ যে আসলে নোবেল প্রাইজ না এবং অর্থনীতির নোবেল লরিয়েটদের নোবেল লরিয়েট বলা হোলে বিশাল অপরাধ হয়ে যাবে— এ নিয়ে বাংলার দামাল বুদ্ধিজীবী, ন্যাশনাল মিডিয়ায় দীর্ঘ সময় আলাপ করেন)।

এটা আমাদের মাথাব্যথা না— আপনি যেভাবে খুশী করেন, এ বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই— এ ধরনের চিন্তা করাও বাঙালির জন্যে ব্ল্যাসফেমি।

বাংলাদেশের মানুষ চরিত্রে সেনট্রিস্ট— সে ওয়াজে গিয়ে চোখের পানি ফেলে আবার যাত্রা দেখেও আদ্র করে মন। দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিকভাবে সফল হওয়ার চাবিকাঠি এই ব্যালেন্সিং এক্টের মধ্যে। যে একদিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে তারই বিপদ। এই জিনিসটা বোঝে বিএনপি এবং এককালে আওয়ামী লীগও বুঝেছিলো। কাজটা করার জন্য সামষ্টিকভাবে যে পরিপক্কতা প্রয়োজন, ইসলামিস্টদের তা তাদের নেই। ভবিষ্যতে হবে কি না জানি না তবে ইসলামিস্টদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হোলো আওয়ামী লীগ। যে একমাত্র যুদ্ধে ধর্মের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী তা হোলো ধর্মযুদ্ধ এবং আওয়ামীবাদ ইসলামিস্টদের একটা ধর্মযুদ্ধই উপহার দিতে চলেছে। যে পোলারাইজেশান প্রজেক্ট আওয়ামী লীগ হাতে নিয়েছে তার একমাত্র ফলাফল হোলো দুটো ধর্মীয় উন্মাদনা: শাহবাগী চেতনা বনাম ইসলামী জজবা। এই ধর্মীয় উন্মাদনা চেতনাবাদকে কয়েকবার ধ্বংস করার জন্য যে যথেষ্ট— এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, পুরো দেশটাই না ধংসাত্মক উন্মাদনায় মশগুল হয়— সেটাই দেখার বিষয়।

সারভাইভাল এক্টে চিন্তা ভাবনার কোনো সুযোগ থাকে না। সমস্যা হোলো সারভাইভাল এক্টের বিজয়ীদের চিন্তা ভাবনা করতে না দেয়ার খেসারত দেয় পুরো জাতি— ইতিহাসে এর শত শত উদাহরণ আছে।

সত্য হোলো; শুধুমাত্র যে একটি পথে ইসলামিস্টরা সফল হতে পারে, ঠিক ওই পথেই তাদের ধাওয়া করছে লীগ।

২০১৪

‘পাকিস্তান’, ‘মেহেরজান’ এবং বাংলা ব্লগস্ফেয়ার

পাকিস্তান নামে মশিউল আলমের একটি ছোটোগল্প সম্প্রতি বিডিনিউজ২৪. কম-এর আর্টস পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। খুব সংক্ষেপে গল্পটি এরকম: মধ্য আশিতে লেখক সভিয়েট রাশায় গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্জনের জন্য। সেখানে লেখক ইমতিয়াজ নামের একজন পাকিস্তানী শিক্ষার্থীর সাথে পরিচিত হন, যাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না তার জাতীয়তার কারণে (লেখকের ভাষ্যে *“আই হেইট পাকিস্তান! আই হেইট অল অফ য়ু, পাকিস্তানীস!”*)।

পরবর্তীতে তিনি দেশে ফেরার পথে ইমতিয়াজের আমন্ত্রণে করাচীতে যান এবং সেখানে তার পরিবারের সাথে পরিচিত হন। ইমতিয়াজের বোন অনিন্দ্য সুন্দরী ফারহানাকে প্রথম দেখাতেই তার ভালো লেগে যায় এবং জানতে পারেন ইমতিয়াজের চাচার কথা, যিনি ’৭১ এ পাকিস্তানী মেজর হিসেবে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এক অনাথ বাঙালি শিশুকে পাকিস্তানে নিয়ে যান এবং নিজের সন্তান হিসেবে প্রতিপালন করেন। লেখকের সাথে যখন তার কথা হচ্ছিলো তখন ছেলেটি লন্ডনে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছে এবং তখন পর্যন্ত তাকে জানানো হয় নি যে সে একজন বাঙালি। ইমতিয়াজের চাচা লেখককে জানান যে তার পরিকল্পনা রয়েছে দত্তক পুত্রকে তার শেকড়ের সন্ধান দেয়ার এবং এর পর যদি সে চলে যেতে চায় বাংলাদেশে, তার কোনো আপত্তি থাকবে না। বহু বছর পর ২০০৩ সালে এসে লেখককে তার বন্ধু সাবেক নৌ-কমান্ডো হুমায়ুন কবির জানান যে বছর কয়েক আগে এক যুবক আলফাডাঙ্গায় এসে মাইকিং করে তার পরিবারের খোঁজ করেছিলো। যুবকটি লন্ডন-ফেরত ব্যারিস্টার, বাংলা জানে না, জানে উর্দু আর ইংরেজি

এবং অলৌকিকভাবে সে তার পরিবারের সন্ধান পায়। লেখকের মনে হয় এই তো সেই ছেলে, ইমতিয়াজের চাচাতো ভাই; জানতে ইচ্ছা হয় কেমন আছে— ইমতিয়াজ আর ফারহানা?

প্রথম পুরুষে লেখা গল্পটির স্থান-কাল-পাত্র এতোটাই বাস্তবানুগ যে নিছক ফিকশান মনে করা দুরূহ। ঘটনাটি গল্প-উপন্যাসকেও হার মানায়। লেখকের সততা আর সাবলীলতা আপনাকে মুগ্ধ করবে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা, তিনি কাউকে জোর করে নায়ক কিংবা খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করেননি, দেখতে চেয়েছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আগ্রহী পাঠকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য।

মশিউল আলম তার রুমমেট ইমতিয়াজকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারেন নি কেননা সে পাকিস্তানী এবং এ অনুযোগে কাল-বিলম্ব না করে ছুটে যান সিনিয়র টিচার আলেকসান্দর মেঝিনস্কির কাছে— একজন পাকিস্তানীর সাথে তিনি রুম শেয়ার করবেন না। কিছু সৌভাগ্যবান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যৌবনের একটি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রুম শেয়ার করতে হয়। বলাই বাহুল্য বেশীরভাগ সময়ে এই অভিজ্ঞতা ঠিক সুখকর হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয়তা, ধর্ম কিংবা বর্ণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে সহ্য করতে না পারাটা যে ব্লেইটান্ট রেইসিজম, এতে কোনোও সচেতন মানুষের সন্দেহ থাকার কথা না। লেখকের সৌভাগ্য যে সময়টা ছিলো ৮০'র দশক আর দেশটা ছিলো সভিয়েট রাশা। আজকের দিনে বহু পশ্চিমা দেশে এ ধরনের আচরণ করলে এবং কোনও শিক্ষক তাতে কর্ণপাত করলে ছাত্রের ছাত্রত্ব আর শিক্ষকের শিক্ষকতার বারোটা বেজে যেতো। লক্ষণীয় হোলো ইমতিয়াজের সুন্দরী বোন ফারহানার প্রেমে পড়ার সময় লেখকের আর মনে থাকে না যে এই মেয়েটিও কিন্তু পাকিস্তানী। ভুলে যান মুক্তিযুদ্ধের কথা, শহীদদের কথা এবং সর্বোপরি নিজের কনভিকশান: *"আই হেইট পাকিস্তান! আই হেইট অল অফ য়ু, পাকিস্তানীস!"*

দয়া করে ভাববেন না লেখকের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। বরং তার আচরণটিই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। মানুষের আচরণ দ্বন্দ্বে ভরা, যা সবসময় যুক্তি দিয়ে বোঝানো সম্ভব না, নর-নারীর সম্পর্কে তো

নয়ই। শিল্পীর কাজ এই দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করা। দ্বন্দ্ববিহীন চরিত্র পানসে, ল্যাবরেটরির সংশ্লেষিত পানির মতোন। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে: একজন আগাগোড়া পাকিস্তান বিদ্বেষী শিক্ষিত বাঙালি যুবক যদি কোন পাকিস্তানী মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে তাহলে কোনোও বাঙালি কিশোরী কেন পাকিস্তানী যুবকের প্রেমে পড়তে পারে না?

মেহেরজানকে নিয়ে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক বিতর্ক এতো সহজ তুলনা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর না, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছি, বাংলা ব্লগস্ফেয়ারে এর প্রতিক্রিয়া দেখে। বেশীরভাগের আবেদন— যেন চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করা হয়। যে কোনো আর্টিস্টিক এন্টারপ্রাইজ তার দর্শক ও শ্রোতাদের অফেন্ড করবে এটাই স্বাভাবিক, শিল্পীর লক্ষ্যই থাকে তাই। এমন কোনো আধুনিক সজীব সমাজ কি আপনি কল্পনা করতে পারেন যেখানে এমন কোনো কাজ রয়েছে যা কাউকে অফেন্ড করে না। কিন্তু তাই বলে একটা শিল্পকর্ম, তা যতো নাখাস্তাই হোক, নিষিদ্ধ করতে হবে কেন? বর্তমান লেখকের মতে বাংলাদেশের এ যাবত কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'মাটির ময়না'। কিন্তু বহু ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের কাছে চলচ্চিত্রটি অফেন্সিভ। বাংলা ব্লগে এদের বিচরণ নেই, ভাষাও অপরিশোধিত, তাই সাংস্কৃতিক রূপকল্পে এসব নন্দনতত্ত্বে অপ্রশিক্ষিতদের অবস্থান গুরুত্বহীন। কিন্তু সংখ্যার বিচারে 'মাটির ময়না-কর্তৃক-অসন্তুষ্টরা' 'মেহেরজান-কর্তৃক-অসন্তুষ্টদের' চেয়ে কম হবে বলে মনে হয় না। তাই বলে কি মাটির ময়নাও নিষিদ্ধ করতে হবে?

আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে (Australian National University) গবেষণা করছি সেখানকার South Asia Film series, COLLEGE OF ASIA & THE PACIFIC-এ মেহেরজানের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলো গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি। প্রদর্শনীটি প্রত্যাহার করা হয়েছিলো... অনিবার্য কারণবশত। চাতুর্যবিদরা বলবেন মেহেরহজানকে সরকার নিষিদ্ধ করে নি, পরিবেশক নিজেই সরিয়ে নিয়েছেন (নিজের ভুল বুঝতে পেরে)। সেটা আরো ভয়ঙ্কর। সেলফ সেন্সরশিপ হোলো এমনই এক উপায়হীন ধর্ষিতা যে চিৎকারের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না।

যে কোনও যুদ্ধ ও বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি— অতি সরলীকরণের আরোপ; বিজয়ী, বিজিত এবং বিশেষত রাজনীতিবিদদের দ্বারা। প্রকৃত

যুদ্ধ বড়ই দুরূহ, সেটা রাক্ষস আর রাজকুমারে হয় না। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। সেখানে কেবল অকুতোভয় বাঙ্গালি যোদ্ধা আর আগ্রাসী হানাদার বাহিনী ছিলো না, ছিলো কলঙ্কময় রাজাকার-আলবদর বাহিনী, আবার ছিলো নিরপরাধ বিহারী হত্যাকারী বাঙ্গালি মুক্তিযোদ্ধা, তেমনি ছিলো পাকিস্তানের বহু বিবেকবান মানুষ যারা ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছিলো। আমরা পছন্দ করি কিংবা না, এদের কাউকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা সম্ভব না। এই সামগ্রিকতার সন্ধান দেয়া কিন্তু শিল্পীর কাজ না, সেটা ঐতিহাসিকের কাজ। শিল্পী সামগ্রিকতার ব্যঞ্জনা দেন সামান্যতা থেকে। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মই এই সামান্য থেকে সামগ্রিকতার পথ তৈরি করে, বাকীরা অকৃতকার্য হন, আর দশটি উদ্যোগের মতোন। বলাই বাহুল্য, মেহেরজান এই উদ্যোগে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা শিল্পীর ব্যর্থতা, শিল্পের ব্যর্থতা; বাড়িয়ে বললে প্রতিভাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত। তাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করার প্রবণতাটি বিপজ্জনক। কেননা আগামীকাল, অন্য কোনো শিল্পীর প্রচেষ্টা হিন্দু কিংবা মুসলমানদের আঘাত করবে, যেহেতু আমাদের মান-অপমান জ্ঞান অতি টনটনে। তখন সেটাকেও নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা হবে এবং মেহেরজানের মতোন পরিণতি আশা করা হবে। আমরা তখন কোন মানদণ্ডে ধর্মীয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুভূতির ওপর আক্রমণকে আলাদা করবো? নাকি আমরা অবিবর্তিত মস্তিষ্কের জন্য উপযোগী চলচ্চিত্রের অপেক্ষায় থাকবো?

ভয়ঙ্কর লেগেছে ব্লগস্ফেয়ারের শিক্ষিত বাঙালিদের উৎকট প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখে। আগ্রহী পাঠকরা বিডিনিউজে মশিউল আলমের গল্পের নীচে একটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন।

"এই গল্পটার মতলববাজি আর কিছুই না, আবারও সেই 'সব পাকিস্তানি খারাপ নয়, কিছু পাকি বাঙালির চেয়েও ভালো' লাইনের প্যাচাল। এই ভালো পাকিস্তানিরা মনে হয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনি বুড়া মানুষ দেখে আপনার আমলে দুয়েকটাকে পেয়ে গল্প রচনায় নেমে পড়েছেন মেহেরজানের মৌসুমে, আমরা ইয়াং দেখে সব প্রতিক্রিয়াশীল, ব্যাকস্ট্যাবার, অসভ্য পাকিস্তানী চারপাশে দেখতে পাই।

পাকিস্তান মানে যেমন শুধু টিক্কা খান না, পাকিস্তান মানে শুধু এইসব ফিকটিশাস ইমতিয়াজই না। পাকিস্তান মানে এক বিরাট সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ছায়ায় একটা বিরাট ইতিহাসমূর্খ জাতি, যারা এখনও নিজেদের আড্ডায় বাংলাদেশকে গালি দিতে পিছপা হয় না, আর মুখোমুখি হোলে শুকনো দুঃখপ্রকাশ করে দায় সারতে চায়। আপনার মতো গল্পকাররা একটা ভিন্নচিত্র দেখাতে গিয়ে সেটার আড়ালে মূল চিত্রটাকে ঢেকে ফেলেন।"

অনুমান হয়, মশিউল আলম এমনকি জনাতিনেক পাকিস্তানীকেও যথেষ্ট গালাগাল করেন নি দেখে পাঠকের এই অভিমান। লক্ষ্য করুন, এই পাঠকের মতে পাকিস্তান মানে... একটা বিরাট ইতিহাসমূর্খ জাতি। কতোজন পাকিস্তানীকে তিনি চেনেন যে এ রকম সিদ্ধান্তে তিনি চলে আসলেন? এই ধরনের বিপজ্জনক জেনারেলাইজেশান থেকেই কিন্তু আমরা হিন্দু-মুসলমান-ইহুদী-কৃশ্চান বিদ্বেষী হয়ে উঠি, হয়ে উঠি সংঘাতময়। নামের প্রথমে 'ভুল' ম থাকলে কেউ কেউ দুইবার ভেবে নেয়, সন্ত্রাসী না তো? মনে করি, যথেষ্ট ঘৃণা পোষণ না করলে আমাদের কনভিকশান প্রমাণিত হয় না, আনুগত্য প্রমাণিত হয় না প্রিয় গোষ্ঠীর প্রতি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ঠিক এভাবেই কিছু ধর্মোন্মাদ মানুষ বলতো লাল পিঁপড়া হোলো হিন্দু পিঁপড়া, হিন্দুদের গায়ে গোবরের গন্ধ–তাদের এই খারাপ, সেই খারাপ, সব খারাপ, শুধু আমরা মুসলমানরাই দেবদূত। বড় বেলায় অবস্থান ও পেশাগত কারণে বহু ভারতীয় ও পাকিস্তানীর সাথে আমার পরিচয় ও সখ্য হয়েছে। মেজরিটির বৈশিষ্ট্য কি আমার জানা নেই (খুব সম্ভবত কারোরই জানা নেই) কিন্তু ধর্ম ও ভাষার কথা বাদ দিলে তেমন কোনো রাষ্ট্রীয় চরিত্র আমার চোখে পড়ে নি যা দিয়ে আমাদের মাঝে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব। আমরা একই যাতনার শিকার, একই লক্ষ্যের যাত্রী, একই স্বপ্ন দেখি— শুধু ভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানী জনগোষ্ঠীর অবস্থা আমাদের চাইতেও করুণ, অনিরাপদ; যারা '৭১ পূর্বেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর লুণ্ঠনে শরিক হয় নি/হতে চায় নি/হতে পারে নি, আজোও সুযোগ-সুবিধার চৌহদ্দির বাইরে। পাকিস্তানকে ঘৃণা করার মানে কিন্তু শুধু পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোকেই ঘৃণা করা না, এই সব অবহেলিত নিরুপায় মানুষদেরও (যারাই পাকিস্তানের ওভারওয়েলমিং মেজরিটি) ঘৃণা করা,

যা দ্বারা বিশেষ গোষ্ঠী, মাস ও ব্লগে পলিটিকালি কারেক্ট হওয়া সম্ভব, কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ দেয়া সম্ভব না। সবচাইতে বড় কথা, যে কারণে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম সে পশ্চিম পাকিস্তানী লুণ্ঠনজীবী শাসকগোষ্ঠীর এমন একটি অপরাধের সন্ধানও কি আপনি দিতে পারেন যা বর্তমান বাংলাদেশী শাসকগোষ্ঠীর মাঝে অনুপস্থিত?

জাতীয়তাবাদের আবেদন এক কল্পিত সমাজের অবতারণায় যেখানে সবাই একই রকম, বৈচিত্রহীন কিন্তু অন্য আরেকটি কল্পিত সমাজ থেকে খুবই আলাদা। বাস্তবতা হোলো অন্য সমাজটি মোটের ওপর আমাদের মতোই। জাতীয়তাবাদ তার ছাত্রদের ভাবতে বাধ্য করে যে, যেকোনো মূল্যে ও পন্থায় এই পার্থক্য বজায় রাখা জরুরী। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই পার্থক্যকে এস্ট্যাব্লিশ করা জরুরী হয়ে যায়, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সমস্যা দেখা যায় পার্থক্যটি এস্ট্যাব্লিশ হয়ে গেলে। আমরা মেনে নিতে পারি না-যে শত্রুকে বধ করার জন্য আমাদের এতো ত্যাগ, সেই শত্রু আসলে মরে নি। তার চেয়েও করুণ বাস্তবতা, 'আমাদের' আর 'ওদের' শত্রুও আসলে খুব আলাদা না। কেউ বলে রাক্ষস আর কেউ খোক্কস, রাত হোলে যে কেবল দুর্বলের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বাস্তবতাকে মানতে পারি না দেখেই যুদ্ধ আর বিপ্লবগুলো ব্যর্থ হয়; আর মেনে নেই সেই আদ্যিকালের সান্ত্বনা: কপালে নেই। নইলে রয়েছে অন্যের ওপর দোষারোপ, যেটা আরো সহজ। একদল বলবে সব ষড়যন্ত্র ভারতের, আরেক দল বলবে পাকিস্তানের। মাঝখান দিয়ে মোটাতাজা হয় আর কেউ না, সেই রাক্ষসটা। আমাদের জীবনটা খুব লম্বা না, অধিকাংশের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক রকমের গুরুত্বহীন। বৃদ্ধ বয়সে তাই প্রয়োজন হয় সান্ত্বনার। মিথ্যা হোক, তবু যেন মিলে যায় একটা 'সেন্স অফ পারপাজ'— বলার মতোন, উদযাপন করার মতোন। আসল রাক্ষসকে চিনতেই পারি নি, এর চেয়ে অনেক সন্তোষজনক আর স্বস্তিকর মনে হয় ভিন্ন এক উপসংহার: নকল রাক্ষসটাকে গালি দিয়েছিলাম বটে।

২০১১

পিতা কন্যাকে

মা আমার

আজ তোমার বয়স এক মাস। আমার আজকের অনুভূতি তোমার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে বহু বছর গত হোলে— হয় তো। তবু লিখতে ইচ্ছে হয় তোমাকে, তোমার প্রজন্মকে। যে পিতৃত্বের দায়, না বর্তায় পুরো প্রজন্মের ওপর, সে পিতৃত্ব বড়ই সঙ্গীন— নিরর্থক। আমার হয়ে সুনীল কী সুন্দর করেই না বলে গিয়েছিলেন এই তাড়নার কথা: *"নবীন কিশোর, তোমায় দিলাম ভূবনডাঙার মেঘলা আকাশ। তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর ফুসফুস ভরা হাসি... তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও। অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার। তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।"*

তোমাকেও আমার কিছু দিতে সাধ হয় মা। জানি না কোনোদিন তোমার চোখে পড়বে কি না এই লেখা, জানি না তুমি নেবে কি না আমার কথা, তবু আশা করেছি— তোমার প্রজন্মের কেউ না কেউ হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে না সবটুকু— সেদিন হয়তো আমি বাবা হয়েই যাবো।

আমি আমার সময়ের বাস্তবতা দেখে তোমার সময়ের বিপন্নতা অনুভব করি, অনুমান করি। ঠিক না জানি তবু পৃথিবীর সব বাবা-মাই হয়তো ভালোবাসার এই নিরুপায় শর্ত-সংকোচে বাধা পড়ে। আর সব বাবার মতো আমারও দ্বিধা হয়, হয় সংকোচ: যেই পৃথিবীটা আমি পেয়েছিলাম, সেটা তোমরা পাবে তো? সব প্রজন্মই মনুষ্যত্বকে ম্রিয়মান ভাবে— সে আন্দাজেই আমি আঁধার দেখি কি না জানি না, কিন্তু মা; আমার প্রচণ্ড ভয় হয়: কী এক ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে তোমরা এসেছো, কোনো ভুল হোলো না তো তোমাদের এনে?

একটু পরেই আমার ভুল কেটে যায়। তোমারই তুলতুলে গালে আমি সাহস পেয়ে পেলবতা চড়াই ভয়ঙ্করের মুখে— যে ভবিষ্যৎ আমাকে নিখাদ ভয় আর নিরাশা ছাড়া কিছুই আপ্যায়ন করে না তারেই ডেকে আমি আদর করি। অজানাকে আপন করা বড়ই কঠিন মা, তুমিই সেই দুঃসাহসের সহায়। তোমার চাহনিতে, তোমাদের চাহনিতেই এক নতুন সাহস-বিধৃত পৃথিবীর উদ্বোধন হয় আমার সামনে। আমি অনুভব করি তোমরাও যে জন্মই দাও, অধরা অজানা ভবিষ্যতের ধাত্রী তোমরা— আঁধারের গহীন গর্ভ থেকে আলোর উদ্ভাসে জন্ম হয় যে সম্ভাবনার শীর্ষ অনুভূতি— সে তো তোমারই আদলে রাঙ্গা।

তোমরা বড় হবে এক কঠিন সময়ে মা। এই পৃথিবী ৭০০ কোটি মানুষকে সয়ে নেবে, কিন্তু ৭০০ কোটি মানুষের মূর্খতা আর লোভ এই একটা বেচারা গ্রহের পক্ষে ধারণ করা বড়ই কঠিন। কেমন হবে সেই প্রতিযোগিতার গলাকাটা উচ্ছ্বাস, কতোটা উৎকট হোলে সামলে নেয়া অসম্ভব হবে মনুষ্যত্ব— তা আমি জানি না মা। দুর্ভাগ্য! আমি শুধু বলতে পারি কী করলে তুমি হয়তো টিকে থাকবে।

আমাদের প্রজন্ম হোলো 'সমাধান প্রজন্ম'। পেশার দিক থেকে, বেঁচে থাকার দিক থেকে আমাদের বাঁচোয়া হোলো সমস্যা সমাধান করতে পারার দক্ষতা। আমাদের সময়ে, অন্তত পেশাগতভাবে প্রবলেম সলভিং এর মধ্যেই টিকে থাকা ছিলো, উন্নতি ছিলো— শুধু শিখরে পৌঁছানোর জন্যেই বরাদ্দ ছিলো কল্পনাশক্তি। কিন্তু তোমাদের সময়ে টিকে থাকার জন্যেও ক্রিয়েটিভিটির দরকার হবে। সেটা যে খুব খারাপ হবে তা মোটেও না। এই যে মানুষের অমিত সম্ভাবনা আর বহুমুখী প্রতিভা, যেটাকে ধ্বংস করার সুশীল একটা নাম দিয়েছিলাম আমরা শিক্ষা-ব্যবস্থা; সেটা তোমাদের কালে বদলে যাবে, এ কথা ভাবলে আমি শিহরিত হই। সেদিন আর দূরে নেই যেদিন সাক্ষরতা আর কল্পনাশক্তি, একই তাগিদে, একই নিক্তিতে কামনা করা হবে। কল্পনাই কেবল— হ্যা মা— কল্পনাই কেবল ঐশ্বরিক, বাকীটুকু প্রাত্যহিক।

কীভাবে কল্পনা করা শিখতে হয় আমার জানা নেই মা, কীভাবে কল্পনাশক্তি ধ্বংস করা যায় সে ব্যাপারে আমি treatise লিখতে পারবো। এক বাক্যে সংক্ষেপ করি: এই ধ্বংসের শুরু হয় স্কুলে আর সমাপন

হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তুমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রগড়পুর থেকে তেড়েফুড়ে বেরুবে— এমন প্রার্থনার জন্যেই তো প্রয়োজন একটা বাবার হাত, মেয়ের মাথার ওপর।

তুমি যখন বড় হবে, হতে থাকবে, দেখবে যে নানান ধরনের শ্রেণীবিন্যাস ও বাইনারী তোমাকে শেখানো হচ্ছে। মানুষ অনেক ধরনের: শাদা-কালো, হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চান, উচ্চ বিত্ত-নিম্ন বিত্ত, বাংলাদেশী-ভারতীয়, শহুরে-গ্রাম্য— বিভেদের কোনো শেষ হয় না। আমি বলছি না যে এসবের কোনো ভিত্তি নেই কিংবা এগুলো সব ভুল। কিন্তু তুমি যখন জীবনকে চিনতে শিখবে, দেখবে যে এগুলোর কোনোটাই আসলে তোমার প্রাত্যহিকতা, তোমার জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত করে না তেমন। শুধু একটা প্রভেদ করে।

নিশ্চিত জেনো মা, পৃথিবীতে মানুষ আছে কেবল দুই ধরনের: গর্দভ এবং বুদ্ধিমান। কোনো জেনারেলাইজেশানই সঠিক না, এটিও না— কিন্তু একে পরম সত্য মেনো, ফর দা সেক অফ স্যানিটি— এটা আমার পরামর্শ। আর গর্দভদের থেকে পারতপক্ষে দূরে থেকো— এটা তোমার বাবার নির্দেশ।

মূর্খতা উচ্চকণ্ঠ, প্রবল ও বৈক্রমিক; মূর্খতা মাত্রই গণতান্ত্রিক। সাম্যের প্রায়শ্চিত্ত হোলো মূর্খতার সাথে সহাবস্থান। একে মোকাবেলা কোরো না কখনো, মুখোমুখি হবে মেধা ও জ্ঞানের। 'ফ্যাক্ট' ও 'ওপিনিয়নের' মাঝে কোনো লড়াই হয় না, হয় মারামারি। মূর্খতার চরিত্র হোলো সে ওপিনিয়নকে ফ্যাক্টে উত্তীর্ণ করে। এই অসম যুদ্ধে আহত হওয়াই একমাত্র পরিণতি। তোমার সময়টা, মাখামাখি না করে দূরে দাঁড়িয়ে মূর্খতাকে উপহাস করার নিরুপায় আমোদটুকু মাতম করার সুযোগ ও জায়গা করে দেবে— এই প্রার্থনা করি।

Idiocy কী এটা জানা খুব জরুরী মা। উমবার্তো একো তোমার কালেও প্রাসঙ্গিক থাকবেন; তিনি stupid ও idiot এর যে বিভাজন করেছেন সেটি মোক্ষম; অবশ্যই পড়ে নেবে। আমার মতামতটুকু জানিয়ে রাখি, হয়তো তোমার কাজে দেবে।

প্রাণী হিসেবে মানুষের অনন্যতার একটা মূল কারণ হোলো প্যাটার্ন রেকগনিশান যার শুরু হয় একদম শুরু থেকে, তোমার এখন যে বয়স তখন থেকেই। তুমি মুখে আঙ্গুল দিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই, মুখে আঙ্গুল দিলে তোমার ভালো লাগে। এমনটা কখনোই হবে না কথা দিচ্ছি, কিন্তু যদি তোমার আঙ্গুলে তিতা স্বাদের কিছু লাগিয়ে দিই, কয়েকবার মুখে আঙ্গুল দেয়ার পর তুমি বুঝতে পারবে যে আঙ্গুল মুখে দিলে কোনো 'মজা' নেই, আছে অস্বস্তি। কিছুদিন পর তুমি মুখে আঙ্গুল দেয়া বন্ধ করবে, আঙ্গুলে কিছু লাগানো না থাকলেও। এটা প্যাটার্ন রেকগনিশনের একদম প্রথম ধাপ; মানুষ যতো বড় হয় ততোই পরিশীলিত হয় এই প্রক্রিয়া।

এই যাকে আমরা ডাক্তারি বলি, এক মোটা দাগের বিচারে সেটা কিন্তু প্যাটার্ন রেকগনিশানই, কিন্তু খুব সফিস্টিকেটেড। ডাক্তার দেখে রোগীর লক্ষণ, তারপর ছকে ফেলে রোগ নির্ণয়, তারপর সে মোতাবেক চিকিৎসা। খেয়াল করো যে এই প্যাটার্ন রেকগনিশান কিন্তু পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও মেধার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। সম্মিলিতভাবে, অভিজ্ঞতার এই যে পরম্পরা, এই যে বিশেষায়িত জ্ঞান— এটিই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কিন্তু প্যাটার্ন রেকগনিশান মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপও। চাও বা না চাও, তুমি নিরন্তর প্যাটার্ন রেকগনাইজ করবে, নিজের অজান্তেই। মূর্খতা খুব সংক্ষেপে হোলো, অপ্রতুল ও সঙ্গতিহীন পর্যবেক্ষণ থেকে প্যাটার্ন রেকগনাইজ করা। কারো দাড়ি-টুপি আছে তো ধরে নাও লোকটা পশ্চাতপদ, কেউ নিজেকে নাস্তিক বললো তো ধরে নাও তার কোনো নৈতিকতা নেই, নামের আগে Dr আছে তো মনে করতে হবে তিনি পণ্ডিত মানুষ— সব মূর্খতাই আদতে এক জিনিস: বিচিত্র সব সিদ্ধান্তে আসা, অদ্ভুত সব বিশ্বাস আর অসংলগ্ন সব পর্যবেক্ষণ থেকে।

অন্যদিকে জ্ঞান হোলো তোমার মাথার ভেতরে বসা প্রহরী, যে প্রতিটা সিদ্ধান্তকে আটকে দেয়, জিজ্ঞাসে: এই সিদ্ধান্তে আসার যথেষ্ট কারণ আছে কি? পাণ্ডিত্যের মানে গৎ এ সাটা জ্ঞান না, কেবল একটি উপলব্ধিতেই সম্পন্ন হয় পাণ্ডিত্য আর সেটা হোলো এনলাইটেন্ড ইগনোরেন্স। কারণ পাণ্ডিত্যই পারে কেবল মনে করিয়ে দিতে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা, হঠকারিতার বিপদ। মনে রেখো মা, মনুষ্যত্বের গুরুতর নির্ণায়ক হোলো

সন্দেহ আর দ্বিধা। যে মানুষ সব ব্যাপারে সহজেই নিশ্চিত হয়ে যায়, সে অসম্পূর্ণ বিবর্তনের শিকার, তাকে সমঝে চলো।

তাই বলে জীবনের সব উপলব্ধি শুধু যুক্তি দিয়ে ছেঁকে তার শুদ্ধতার ওজন করলে মনুষ্যত্বের অবমাননা হবে না? বিশ্বাসের স্থান তাহলে কোথায়?

যুক্তি ও বিশ্বাস দুটোই আমাদের চালিকা, দুটোই আমাদের প্রয়োজন কিন্তু মনে রেখো— দুটোই ডোমেইন স্পেসিফিক। এই ক্ষেত্র নির্দিষ্টতাকে সম্মান করবে এবং কখনোই যুক্তি ও বিশ্বাসকে এক বিন্দুতে আনার চেষ্টা করো না। কোরানের মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজবে না, আর বিজ্ঞানের মধ্যেও ইসলাম বা অন্য কোনো বিশ্বাস খুঁজতে যেয়ো না। কখনো যদি বিশ্বাস আর যুক্তির টানাপোড়েনে দুটোকে মেলানোর তাগিদ উদগ্র হয়ে ওঠে, জেনো যে মিডিয়োক্রিটির ভূত তোমার মাথায় সওয়ার হয়েছে। এ থেকে মুক্তির একটাই উপায় আছে: তোমার মাথাটাকে এমনভাবে গড়ে-পিটে নিয়ো সে যেন দুটোকে সমান্তরালে চলার অনুমতি দেয়, মিলিয়ে না ফেলে। কোথায় বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেবে এ ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই— এটাই তোমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা— দুঃখিত মা— এ পথ তোমাকে একলাই পাড়ি দিতে হবে। তবে সবসময় মনে রেখো, আটবার ব্যর্থ হওয়ার পর নয়বারে সফল হওয়ার যে চেষ্টা, যে আকুতি— কোনো কিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না— এই যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা একান্তই বিশ্বাসের কারসাজি; কোনো যুক্তি এই স্পর্ধার সঞ্চার করবে না, কখনোই।

প্রায় এ কারণেই আমার অনুরোধ কোনো একটা আইডিয়ালিজমকে গ্রহণ করো। ১৮ বছর বয়সে আইডিয়ালিস্ট হওয়াটা জরুরী, প্রেরণা খুব সহজলভ্য জিনিস না, কিন্তু ২৮ বছর বয়সে যদি বুঝতে না পারো যে কোনো আইডিয়ালিজমেই মানুষের মুক্তি নেই, বুঝবে যে বোধগম্যতার চড়াই পথে তোমার ফাঁড়া আছে। মানুষ এতোই বুদ্ধিমান যে খুব সহজেই ধরে ফেলে ফাঁকটা: কোনো 'একটি' মতবাদে আমাদের সব সমস্যার সমাধান আছে— এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। কিন্তু সে এতোই বোকা যে কোনোদিনও বুঝবে না যে সব মতবাদের কাজের কথাটা নিতে পারলে আমাদের বেশীরভাগ সমস্যার সমাধান করা যেতো— এটা বিশ্বাস করানো খুবই কঠিন।

কোনো আদর্শবাদই মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। আদর্শবাদ শুরু হয় আমাদের সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশকে উৎসর্গ করে কিন্তু সাফল্যের পথে তার প্রথম পা, এই অমিত শক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সমস্যা সমাধানে যে অভূতপূর্ব সৃজনশীলতায় সে সফলতা পায় প্রথমে, সেই ক্রিয়েটিভিটিই এই যাত্রার প্রথম শহীদ— অনড় থেকে অনড়তর হয়ে ওঠাই আদর্শবাদের একমাত্র পরিণতি। আদর্শবাদ, সমস্যা চিহ্নিত করার ব্যাপারে আধুনিকতম কিন্তু সমাধানে প্রাচীন কেননা সে মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারলেও মানুষের মেধার ওপর ভরসা করতে পারে না। তাই সে পূর্বতর মহাপুরুষের মেধা ও প্রজ্ঞার ওপরই শুধু আস্থা রাখে। সব আদর্শবাদকেই জুতার মাপে পা কাটতে হয়, কোথাও না কোথাও।

তবু মা, আদর্শের সঙ্গ ছেড়ো না— সে তোমাকে বিনয়ী হতে শেখাবে। এই গর্দভসংকুল পৃথিবীতে বিনয়ী না হওয়ার এতো প্ররোচনা, এতো প্রলোভন যে কাজটা ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে। আদর্শ, বড় কোনো ধারণার সামনে তোমাকে মাথা নোয়াতে শেখাবে। এই 'বড়' ধারণাটা সত্য কি না শুধু এটাই বিবেচ্য না, সমর্পনের প্রবণতাটা জরুরী মা, স্বাস্থ্যের জন্য।

তবে কি, বিনয়টা সুসভ্য বনসাই শ্লাঘার জন্য না, বরাদ্দ রেখো নিজের আত্মার জন্য। অন্যকে তৃপ্ত করার জন্য যে বিনয়, ভণ্ডামিতে বদলে যাওয়ার জন্য সে তক্কে তক্কে থাকে। এই দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার বেশ কিছু উপায় আছে হয়তো, আমার জানা আছে কেবল একটি: এলিটিজম আত্মস্থ করার পথ। আমি চাই তুমি নিঃসংকোচ এলিটিস্ট হও। এলিটিজম তোমার নৈতিকতার প্রশ্নকে রুচির প্রশ্নে নিষ্পন্ন করতে বাধ্য করবে— এটা খুব জরুরী মা। আমি ঘুষ খাবো না, এই সিদ্ধান্তের জন্যে যদি কোরান-হাদীস, কিংবা আইনী শাস্তির ভয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে মানুষটার ক্ষুদ্রতা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ঠ কারণ আছে, জেনো।

আমাদের বড় মানুষেরা প্রায়ই ছোটো কাজ করেন, খুব ছোটো কাজ করেন, কারণ এলিটিস্ট হওয়ার মতো স্পর্ধা তাদের নেই। এই দেশে আভিজাত্যের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি থাকলে লজ্জা শরমেরও উপস্থিতি থাকতো খানিকটা। আভিজাত্য বোধই কেবল পারে তোমাকে শেখাতে যে আমি বরং হেরে যাবো কিন্তু নিজেকে ছোটো করতে পারবো না। আমি

অপরাধী তার চাইতেও অনেক অনেক বেশী অনাকাঙ্ক্ষিত— লোকে বলুক যে আমি নিম্ন রুচির। অপরাধকে 'অপরাধ' বলে মেনে নেয়াটাই আমার ব্যক্তিগত পরাজয়, কোনোভাবেই আমি একে রুচির প্রশ্নের চেয়ে এতোটুকু ওপরে উঠতে দেবো না— কেননা এতে আমার মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়— এসব খুব বিচিত্র অনুভূতি মা, সারা জীবন তুমি এলিটিজমকে গাল দেয়াটা পলিটিকালি কারেক্ট বলে শিখবে কিন্তু মহাপুরুষ ছাড়া অন্য কেউ এইসব উপলব্ধিতে এসেছেন এলিটিজমের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথে, এমন উদাহরণ আমার জানা নেই।

তবে মা এই পথটা স্খলন-সংকুল, বুঝে চলো। শুধু একটা কথা মনে রাখবে: এলিটিজমের উৎস যদি হয় এমন কিছু যা তোমাকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয় নি জানবে যে তুমি তোমার ধ্বংসের বন্দোবস্ত করছো। আর হ্যা, আভিজাত্য যদি প্রকাশ করতে হয় কসরত করে, সংঘবদ্ধ হয়ে, মনে রেখো যে তুমি আসলে সম্পন্নতা না, তোমার দীনতা প্রকাশ করছো।

অনকে কথাই তোমাকে বলা হোলো। সমস্যা হলো, আমি জানি না কোনটা তোমার কাজে লাগবে, আদৌ লাগবে কি না? এ যে কি গভীর বেদনার উপলব্ধি, বোঝাতে পারবো না মা। নিশ্চিতভাবে জানি randomness তোমার জীবন, তোমাদের জীবনকে প্রচণ্ড ভাবে প্রভাবিত করবে— আপসোস আমার! আমি এর কিছুই জানি না। এই যে হতচ্ছাড়া random events যা তোমার জীবনকে শুধু প্রভাবিতই করবে না, নিয়ন্ত্রণও করবে একরকম, একে শুধু দার্শনিক ভাবে দেখবে না— উপভোগও করো; এটাই তো মনুষ্যত্বের উদযাপন। মনে রেখো মা, তুমি কেমন মানুষ তার সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক কী তোমাকে বিনোদিত করে। তাই বিনোদনের রসদ নির্বাচনে সাবধান হয়ো। এ নিরিখেই তোমার প্রতি আমার শেষ উপদেশ।

সুন্দরকে রক্ষা করো মা, সব কিছু দিয়ে। আর কিছুই সর্বস্ব দাবী করে না।

২০১৩

আলোকচিত্র: হাসিব জাকারিয়া

লেখালেখির শুরু যায়যায়দিনে; প্রবাস পিঞ্জর ও স্বদেশ বিহঙ্গ শিরোনামের দুটো নিয়মিত কলাম লিখতেন। পড়াশোনা: কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, য়ুনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন সিডনি ও অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি। মলিকিউলার থেরাপিউটিক্সে পিএইচডি, পোস্ট-ডকে স্টেম সেল রিসার্চ— এখন কাজ করছেন রেগুলেটরি সায়েন্সে। গত দশ বছরে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন "বাঙালির মিডিয়োক্রিটির সন্ধানে" ফাহাম আব্দুস সালামের প্রথম বই। তার আগ্রহ: মনস্তত্ত্ব, ভাষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও ধর্ম। ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন ঢাকার ইতিহাস নিয়ে। ২০০৪ থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী।

ফাহাম আব্দুস সালাম, শেহভারের বাবা।

প্রচ্ছদ: স্টেফান উইলআয়ের্ট-এর ছবি অবলম্বনে নিয়াজ আহমেদ অংশু